তাওহীদ পরিচিতি

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

ড. সালিহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান

৪০৩

অনুবাদ: ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

عقيدة التوحيد

د/ صالح بن فوزان الفوزان

ﻛﻙ

ترجمة: د/ محمد منظور إلهي

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি ছাড়া আর কোনো রব নেই, আর কোনো প্রকৃত মা'বুদও নেই। দুরূদ ও সাল্লাম বর্ষিত হোক সৃষ্টিকুল শিরোমণি তাওহীদের বাণী প্রচারক শেষ নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবী এবং তাঁর সঠিক অনুসারী সেই সব বীর সেনানীদের ওপর যাদের মাধ্যমে তাওহীদের শাশ্বত পয়গাম সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

"আমি জিন্ন ও ইনসান জাতিকে কেবল আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি" - মহান আল্লাহর এ ঘোষণার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাওহীদের মূলকথা। তাইতো সকল নবী ও রাসূলগণ নিজ নিজ উম্মাতদেরকে শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাতের দিকেই প্রথম আহ্বান জানিয়েছিলেন। সুতরাং তাওহীদকে উত্তমরূপে বুঝে সে আলোকে জীবনকে পরিপূর্ণরূপে ঢেলে সাজানো প্রত্যেক মুসলিমের আশু কর্তব্য। তাওহীদ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে যে কেউ সহজেই শির্ক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে এবং সে সাথে তার আখিরাতের জীবন হয়ে পড়তে পারে ভয়ানক ভাবে বিপন্ন।

বাংলা ভাষাভাষী প্রত্যেক মুসলিম যাতে তাওহীদ সম্পর্কে সহজে সঠিক ধারণা অর্জন করতে পারে সে উদ্দেশ্যে ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রফেসর এবং সৌদী আরবের উচ্চ উলামা পরিষদের অন্যতম সদস্য ড. সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযানের লেখা **'কিতাবুত তাওহীদ'** বইটির অনুবাদের তাড়া অনুভব

করি। মূল আরবী বইটির নাম ছিল ‘আকীদাতুত তাওহীদ’ বা তাওহীদী আকীদা। তাওহীদকে যাতে মুসলিমগণ নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে সে ভিত্তিক জীবন গড়তে পারেন, সে জন্য যে সব বিষয়ে জ্ঞানার্জন অত্যাবশ্যকীয় -এমন সব বিষয়ের আলোচনাই এ বইতে পেশ করা হয়েছে। এ বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। **‘ইসলামী আকীদার পরিচয়’** এ বইয়েরই প্রথম দু’টি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ প্রথম দু’টি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর স্বতন্ত্র গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা ইসলাম হাউসের ওয়েবসাইটে দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। কারণ, বাকী অংশ পূর্ব থেকেই ইসলাম হাউসের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।

বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয়ভাবে সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন এ বইয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অনুবাদে এ বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব ফুটিয়ে তোলার ব্যাপারে আন্তরিক প্রয়াস ছিলো। তা সত্ত্বেও যে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। যে কোনো ভুল-ত্রুটির প্রতি সহৃদয় পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ কিংবা তাদের দেওয়া যে কোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। এ অনুবাদের পরিমার্জনায় সাহায্য করে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যারা সক্রিয় অবদান রেখেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ্ আমাদের, তাদের ও আরো যারা এ কাজে সহায়তা করেছেন -সবার সৎকর্মগুলো কবুল করুন! আমীন!!

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সত্যবাদী বিশ্বস্ত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর।

এটি তাওহীদ বিষয়ক একটি গ্রন্থ। এতে সহজ ও সাবলীল পদ্ধতি প্রয়োগের পাশাপাশি বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু বহু উৎস গ্রন্থ তথা আমাদের বড় বড় ইমামদের গ্রন্থাবলী থেকে বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ, আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম, শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহ্হাব ও তার ছাত্রবৃন্দের ন্যায় মুবারক দাওয়াতী কাজের বীরসেনানী বড় বড় ইমামদের গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে। **সন্দেহ নেই ইসলামী আ**কীদার বিষয়টি সেই মৌলিক জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত, যা শিক্ষা করা, অপরকে শিক্ষা দেওয়া ও সে মোতাবেক আমল করা যথার্থ গুরুত্বের দাবীদার, যাতে করে বান্দার আমল সহীহ্ হয়, আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্য হয় এবং আমলকারীর জন্য তা উপকারী হয়। বিশেষ করে আমরা এমন এক সময়ে অবস্থান করছি, যখন নাস্তিকবাদ, সূফীবাদ, বৈরাগ্যবাদ, পৌত্তলিক কবর পূজা এবং মহানবীর আদর্শের পরিপন্থী বিদ'আতের ন্যায় ভ্রান্ত মতাদর্শসমূহের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। এ রকম গোলযোগপূর্ণ পরিবেশে মুসলিম যদি কুরআন, সুন্নাহ এবং সালাফে-সালেহীনের তরীকা অনুযায়ী বিশুদ্ধ আকীদার অস্ত্রে সুসজ্জিত

হতে না পারে, তাহলে এ সব বিকৃত মতাদর্শসমূহ তার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠবে এবং তাকে গ্রাস করবে। আর তাই মুসলিমদের সন্তানদেরকে যাতে আকীদার আসল উৎসসমূহ থেকে বিশুদ্ধ আকীদা শিক্ষা দেওয়া যায়, সে ব্যাপারে পূর্ণ গুরুত্ব প্রদান ও ব্যবস্থা নেওয়া জরুরী।

ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লামা ‘আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহবিহী...

ইসলামী আকীদার পরিচয়

এতে রয়েছে নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদসমূহ:

প্রথম পরিচ্ছেদ:

আকীদার অর্থ এবং দীনের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে এর গুরুত্বের বর্ণনা

আকীদার আভিধানিক অর্থ:

আকীদা শব্দটি আরবী العَقدُ العَقدُ (আল-‘আকদু) থেকে গৃহিত। এর অর্থ কোনো কিছু বেঁধে রাখা। বলা হয় عَقدْتُ عَليْهِ القلبَ وَالضَّمِيْرَ অর্থাৎ আমি এর ওপর হৃদয় ও মনকে বেঁধেছি। আকীদা হলো ঐ বিষয়, মানুষ যা মেনে চলে। বলা হয়, ‘তার আছে সুন্দর আকীদা’ অর্থাৎ এমন আকীদা যা সন্দেহমুক্ত। আকীদা অন্তরের কাজ। অন্যভাবে বলা যায়, আকীদা হলো কোনো বিষয়ের প্রতি অন্তরের ঈমান ও প্রত্যয় এবং অন্তর দিয়ে সে বিষয়কে সত্য প্রতিপন্ন করা।

আকীদার শর‘ঈ অর্থ:

শরী‘আতের পরিভাষায় আকীদা হলো: আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাইকা (ফিরিশতা), তাঁর গ্রন্থসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান পোষণ এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান রাখা। আর এগুলোকে বলা হয় ঈমানের রুকন।

শরী‘আত দু’ভাগে বিভক্ত: আকীদা ও আমল তথা অন্তরের বিশ্বাসগত বিষয় ও দৈহিক, আর্থিক কর্মকাণ্ডগত বিষয়:

আকীদাগত বিষয়সমূহ হলো এমন যা কাজে রূপায়িত করার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় অর্থাৎ যার কোনো বাহ্যিক কার্যরূপ নেই। যেমন এই আকীদা পোষণ করা যে, আল্লাহ্ রব এবং তাঁর ইবাদাত করা ওয়াজিব। একইভাবে ঈমানের উল্লেখিত বাকী রুকনগুলোর প্রতিও বিশ্বাস রাখা। এগুলোকে বলা হয় মৌলিক বিষয়।

আর আমলী বিষয়সমূহ হলো এমন যা কার্যে পরিণত করা যায়, যেমন সালাত আদায়, যাকাত প্রদান, সাওম পালন ও যাবতীয় সকল আমলী বিধান। এগুলোকে বলা হয় আনুষঙ্গিক বিষয়। কেননা এগুলোর শুদ্ধাশুদ্ধি উক্ত মৌলিক বিষয়সমূহের শুদ্ধাশুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল।[1]

অতএব, বিশুদ্ধ আকীদা হলো এমন মৌলিক ভিত্তি যার ওপর দীন স্থাপিত এবং যা থাকলে আমল শুদ্ধ ও সহীহ হয়। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠﴾ [الكهف: ١١٠]

“অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]

---

[1] শারহুল-আকীদাহ আস-সাফারিনিয়া ১/৪।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَلَقَدۡ أُوحِيَ إِلَيۡكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكَ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٦٥﴾ [الزمر: ٦٤]

"তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি (আল্লাহর সাথে) শরীক কর তাহলে তোমার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ٢ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلۡخَالِصُۚ﴾ [الزمر: ٣]

"অতএব, তুমি ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদাত কর। জেনে রাখ, আল্লাহর জন্যই নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাত ও আনুগত্য।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ২-৩]

সুতরাং এই মহান আয়াতসমূহ ও অনুরূপ অর্থে আরো বহুসংখ্যক যে আয়াতসমূহ এসেছে তা এ প্রমাণই বহন করছে যে, আমল শির্ক থেকে মুক্ত না হওয়া ব্যতীত কবুল হয় না। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই রাসূলগণ (আল্লাহ তাদের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন) সর্বপ্রথম আকীদা সংশোধনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই তারা সর্বপ্রথম স্ব-স্ব জাতির লোকদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ও অন্য সব কিছুর ইবাদাত ত্যাগ করার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]

“আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসূলকে প্রেরণ করেছিলাম এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাগুতকে পরিহার করবে।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

প্রত্যেক রাসূলই তার জাতিকে প্রথমে এ কথা বলে সম্বোধন করেছিলেন যে, ﴿ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓ ۝٥٩﴾ [الاعراف: ٥٨] “তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের প্রকৃত আর কোনো ইলাহ নেই।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৮৫] এ কথাটি বলেছিলেন নূহ, হুদ, সালেহ, শু‘আইব এবং সকল নবীগণ (আল্লাহ তাদের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন) তাদের নিজ নিজ জাতির উদ্দেশ্যে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের পর তের বছর ধরে মানুষকে তাওহীদের প্রতি ও আকীদার সংশোধনের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকলেন। কেননা আকীদাই হচ্ছে ঐ মূলভিত্তি যার ওপর দীনের ভিত্তি স্থাপিত। **আর প্রত্যেক যুগেই দা**‘ঈ-ইলাল্লাহ ও সংস্কারকগণ নবী ও রাসূলগণের সে আদর্শের অনুসারী ছিলেন। তারা তাওহীদের প্রতি ও আকীদা সংশোধনের প্রতি আহ্বান করার মাধ্যমেই তাদের কাজ শুরু করেছিলেন। এরপর তারা দীনের অন্যান্য নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের দিকে মনোনিবেশ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

আকীদার উৎসগ্রন্থ এবং আকীদা বিষয়ক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলিমগণের নীতি

আকীদার জ্ঞান ওহী নির্ভর। সুতরাং শরী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে কোনো দলীল বা প্রমাণ ছাড়া কোনো আকীদা সাব্যস্ত করা যাবে না। আকীদার ক্ষেত্রে নিজস্ব রায়, অভিমত ও ইজতিহাদের কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং আকীদার উৎস শুধুমাত্র আল-কুরআন ও সুন্নায় যে তথ্য এসেছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কেননা আল্লাহ সম্পর্কে এবং আল্লাহর জন্য কি হওয়া সঙ্গত এবং কোন কোন বস্তু থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র তা তাঁর চেয়ে বেশি আর কেউই জানে না। আর আল্লাহর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে আল্লাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞান আর কেউই রাখে না। এজন্যই আকীদা অর্জনের ক্ষেত্রে সালাফে সালেহ তথা পূর্ববর্তী বিজ্ঞ সৎ আলিমদের ও তাদের অনুসারীদের নীতি ছিল আল-কিতাব তথা আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ'র মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা।

অতএব, আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ যে প্রমাণ বহন করছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছেন, সেভাবেই আকীদাকে সাজিয়ে নিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেছেন। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ দ্বারা যা প্রমাণিত হয় নি আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তা তারা অস্বীকার করেছেন এবং প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ কারণেই আকীদার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ হয় নি, বরং তাদের

সকলের আকীদা ছিল এক ও অভিন্ন এবং তাদের জামায়াত বা দলও ছিল একটি। এর কারণ হলো, যারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরে, আল্লাহ তা'আলা তাদের এক কালেমায় ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং সঠিক আকীদা ও এক নীতির অনুসারী হওয়ার গ্যারান্টি দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ﴾ [ال عمران: ١٠٣]

"আর তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿فَإِمَّا يَأۡتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدٗى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ ١٢٣﴾ [طه: ١٢٣]

"তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত এসে গেলে যে ব্যক্তি আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে সে ভ্রষ্ট হবে না এবং হতভাগ্যও হবে না।" [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ২৩]

এ জন্যই এদেরকে অভিহিত করা হয়েছে "আল-ফিরকাহ আন-নাজিয়াহ" অর্থাৎ বিজয়ী দল অথবা মুক্তিপ্রাপ্ত দল নামে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পক্ষে নাজাতের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যখন উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে বলে তিনি খবর দিয়েছেন, যে দলগুলোর একটি ছাড়া বাকী সবগুলো দল জাহান্নামী হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। আর যখন এ একটি দল সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, "আমি ও আমার

সাহাবীগণ আজ যে আদর্শের ওপর রয়েছি যারা সে আদর্শের ওপর থাকবে তারাই সে মুক্তিপ্রাপ্ত বা নাজাতপ্রাপ্ত দল।"[2]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সংবাদ দিয়েছিলেন বর্তমানে তার সত্যতা বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। যখন কিছু লোক আল-কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য বিষয় যেমন ইলমুল কালাম ও গ্রীকদর্শন থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মানতেক তথা তর্কশাস্ত্রের নীতিমালার ওপর তাদের আকীদার ভিত্তি স্থাপন করেছে, তখন তাদের আকীদায় বক্রতা ও অনৈক্য দেখা দিয়েছে, যার ফলে তাদের কথা ও বক্তব্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভক্তি, দেখা দিয়েছে মুসলিম জামায়াতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে ইসলামী সমাজের ভিত্তি ।

---

[2] হাদীসটি ইমাম আহমদ মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

সঠিক আকীদা থেকে বিচ্যুতির কারণ এবং তা থেকে বাঁচার পন্থাসমূহ

বিশুদ্ধ আকীদা থেকে বিচ্যুত হওয়া ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণ। কেননা বিশুদ্ধ আকীদাই কল্যাণকর আমল করার শক্তিশালী প্রেরণাদায়ক উপাদান। বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া যে কোনো ব্যক্তি ধারণা-কল্পনা ও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যেতে পারে, যা অতি সহজেই তার মন মস্তিষ্কে দানা বেঁধে সুখী জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ থেকে তাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। ফলে তার জীবন হয়ে পড়বে সঙ্গীন ও সংকীর্ণ। এরপর সে আত্মহত্যার মাধ্যমে হলেও তার জীবনকে শেষ করে এ সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করবে, যেমন এ ব্যাপারটি বহু লোকের জীবনে বাস্তব হয়ে উঠেছে যারা সঠিক আকীদার হিদায়াত লাভ করতে পারে নি। সঠিক আকীদা যে সমাজকে পরিচালিত করে না সে সমাজ একটি পাশবিক সমাজ, যা সুখী জীবনের সকল মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে, যদিও সে সমাজ বৈষয়িক জীবনের বহু উপাদানের মালিক হয়ে থাকে, যে উপাদানগুলো অধিকাংশ সময় সমাজকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়। আমরা অমুসলিম সমাজের মধ্যে এ ধরনের বহু দৃশ্য অবলোকন করি। কেননা বৈষয়িক এ উপাদানসমূহ সঠিক উপদেশ ও দিকনির্দেশনার মুখাপেক্ষী, যাতে এগুলোর কার্যকারিতা ও কল্যাণ থেকে উপকৃত হওয়া যায়। আর সঠিক ও বিশুদ্ধ আকীদা ছাড়া অন্য কোনো কিছু সত্যিকার দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ﴾ [المؤمنون: ٥١]

“হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও ভালো বস্তু থেকে খাও এবং সৎ কাজ কর।” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৫১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضۡلٗاۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُۥ وَٱلطَّيۡرَۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلۡحَدِيدَ ١٠ أَنِ ٱعۡمَلۡ سَٰبِغَٰتٖ وَقَدِّرۡ فِي ٱلسَّرۡدِۖ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١ وَلِسُلَيۡمَٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهۡرٞ وَرَوَاحُهَا شَهۡرٞۖ وَأَسَلۡنَا لَهُۥ عَيۡنَ ٱلۡقِطۡرِۖ وَمِنَ ٱلۡجِنِّ مَن يَعۡمَلُ بَيۡنَ يَدَيۡهِ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦۖ وَمَن يَزِغۡ مِنۡهُمۡ عَنۡ أَمۡرِنَا نُذِقۡهُ مِنۡ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٢ يَعۡمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٖ كَٱلۡجَوَابِ وَقُدُورٖ رَّاسِيَٰتٍۚ ٱعۡمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكۡرٗاۚ وَقَلِيلٞ مِّنۡ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ١٣﴾ [سبأ: ١٠، ١٣]

“আর আমরা নিশ্চয় দাঊদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (আদেশ করেছিলাম) হে পর্বতমালা! তোমরা দাঊদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং বিহঙ্গকূলকেও। তার জন্য নমনীয় করেছিলাম লৌহ। (নির্দেশ দিয়েছিলাম) তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম প্রস্তুত করো এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা কর। আর সৎকাজ কর। তোমরা যা কিছু করো আমি তার সম্যকদ্রষ্টা। আর আমরা সুলাইমানের অধীন করেছিলাম বায়ূকে যা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমরা তার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। তার রবের অনুমতিক্রমে জিন্নদের কতক তার সম্মুখে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ থেকে বিচ্যুত

হয় তাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাবো। তারা সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণ করত। (আমি বলেছিলাম) হে দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে তোমরা কাজ করতে থাকো, আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ।” [সূরা সাবা, আয়াত: ১০-১৩]

অতএব, বৈষয়িক শক্তি থেকে আকীদার শক্তি বিচ্ছিন্ন না হওয়া অত্যন্ত জরুরী। কেননা বাতিল আকীদার দিকে ধাবিত হয়ে সঠিক আকীদা থেকে বৈষয়িক শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করলে বৈষয়িক শক্তি ধ্বংস ও অধঃপতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমনটিই আজ কাফির রাষ্ট্রসমূহে পরিদৃষ্ট হচ্ছে, যারা বৈষয়িক শক্তির অধিকারী বটে, তবে কোনো সহীহ আকীদা তারা পোষণ করে না।

সহীহ আকীদা থেকে বিচ্যুত হওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে যেগুলো জানা অপরিহার্য। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. সহীহ আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞতা। আর এ অজ্ঞতার কারণ হচ্ছে সহীহ আকীদার পঠন থেকে বিমুখ থাকা অথবা সহীহ আকীদা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না থাকা বা কম থাকা। যার ফলে এমন এক প্রজন্ম সৃষ্টি হয় যারা সে আকীদার কিছুই জানে না এবং এও জানে না সে আকীদার বিরোধী বস্তুগুলো কি, সে আকীদার বিপরীত চিন্তাভাবনাগুলো কি। যার ফলে সে প্রজন্ম হক্ক ও সত্যকে বাতিল বলে বিশ্বাস করে এবং বাতিলকে হক্ক বলে বিশ্বাস করে। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, ‘ইসলামের রজ্জুতো এভাবে একটি

একটি করে নষ্ট হয়ে যাবে যখন ইসলামের মধ্যে এমন ব্যক্তি তৈরি হবে যারা জাহিলিয়্যাতের পরিচয় জানবে না।’[3]

২. বাপ-দাদা তথা পূর্বপুরুষগণ যে মতাদর্শের ওপর ছিলেন সে ব্যাপারে গোড়ামী প্রদর্শন এবং বাতিল হওয়া সত্ত্বেও কঠোরভাবে তা আঁকড়ে থাকা আর হক্ব ও সত্য হওয়া সত্ত্বেও এর বিপরীত যা রয়েছে তা পরিত্যাগ করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٧٠﴾ [البقرة: ١٧٠]

“যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো। তারা বলে, আমরা তো অনুসরণ করবো যার ওপর আমাদের পূর্ববর্তী পুরুষদেরকে আমরা পেয়েছিলাম। (তারা কি এমনই করবে?) যদিও তাদের পূর্ববর্তী পুরুষগণ কিছুই উপলব্ধি করতো না এবং সুপথ পেত না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৭০]

৩. দলীল-প্রমাণ জানা ছাড়াই আকীদার ক্ষেত্রে মানুষের বক্তব্য অন্ধভাবে মেনে নেওয়া। যেমনটি বাস্তবে লক্ষ্য করা যায় জাহমিয়া, মু‘তাযিলা, আশ্‌আরীয়া, সূফিয়া প্রমূখ সত্যবিরোধী দলসমূহের ক্ষেত্রে। কেননা তারা তাদের পূর্ববর্তী ভ্রষ্ট ইমাম ও নেতৃবৃন্দের অন্ধ অনুকরণ করেছে। ফলে তারা বিশুদ্ধ আকীদা থেকে বিভ্রান্ত এবং বিচ্যুত হয়ে গেছে।

[3] মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ২/৩৯৮, মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৪৩, মুখতাসার সিরাত আর-রাসূল, মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ ১/৩৯।

৪. অলী-আওলিয়া ও সৎলোকদের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা, তাদেরকে তাদের মর্যাদার উপরে স্থান দেওয়া এবং তাদের ব্যাপারে এ আকীদা পোষণ করা যে, তারা কল্যাণ সাধন অথবা অকল্যাণ রোধ করতে পারেন। অথচ কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কেউই তা করতে সক্ষম নন। আর তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হাজত পূরণ ও দো‘আ কবুলের ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যার ফলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরই ইবাদাত করা হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তাদের মাযারসমূহে পশু যবেহ করা, মানত করা, দো‘আ করা, আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে নৈকট্য ও সাওয়াব অর্জন করা যায় বলে বিশ্বাস করা। যেমনটি করেছিল নূহ আলাইহিস সাল্লামের সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী সৎ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যখন তারা বলেছিল,

﴿وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمۡ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّٗا وَلَا سُوَاعٗا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسۡرٗا ٢٣﴾

[نوح: ٢٣]

“তোমরা তোমাদের ইলাহদেরকে পরিত্যাগ করো না, তোমরা পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূওয়া‘আ, ইয়াগুস, ইয়া‘উক ও নাসরকে।” [সূরা নূহ, আয়াত: ২৩]

এরকমই আজ অনেক দেশে দেখা যায় কবরপূজারীদের ক্ষেত্রে।

৫. আল্লাহর পার্থিব নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা থেকে গাফিল থাকা, আল্লাহর নাযিলকৃত আল-কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা থেকে সরে যাওয়া ও বস্তুবাদী সভ্যতার চোখধাঁধাঁনো নানা অর্জন নিয়ে মত্ত থাকা; যার ফলে তাদের ধারণা হয় যে, এসব কিছু একমাত্র মানুষেরই

সামর্থের ফসল। ফলে তারা মানুষকে অতি মাত্রায় সম্মান দিতে থাকে এবং এ সকল অর্জন শুধু মানুষের পরিশ্রম ও আবিষ্কারের ফসল বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। ইতঃপূর্বে আল-কুরআনের ভাষায় কারূন যেমন বলেছিল,

﴿قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِيٓۚ﴾ [القصص: ٧٨]

"সে বলেছিল, নিশ্চয় এগুলোতো আমি প্রাপ্ত হয়েছি আমার জ্ঞানের ভিত্তিতেই।" [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৭৮]

যেমনিভাবে অন্য সূরাতে মানুষ বলছে: ﴿هَٰذَا لِي﴾ অর্থাৎ "এটি আমার।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৫০]

﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ﴾ "নিশ্চয় আমি তা প্রাপ্ত হয়েছি জ্ঞানের আলোকেই।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৯]

অথচ ঐ সত্ত্বার বিশালত্ব ও মহত্ত্বের ব্যাপারে তারা কোনো চিন্তা ও গবেষণা করে নি যিনি এ বিশ্বজগতের সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন, আর সে সবের মধ্যে রেখে দিয়েছেন চোখধাঁধানো সব বৈশিষ্ট্য, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টির সে সব বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে মানুষকে সামর্থ দান করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ٩٦﴾ [الصافات: ٩٦]

"আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা করো সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৯৬]

﴿أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيۡءٖ﴾ [الاعراف: ١٨٤]

“তারা কি নযর দেয় নি আসমান ও যমীনের সৃষ্টির প্রতি এবং সে সকল কিছুর প্রতি যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন?” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮৫]

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ لِتَجۡرِيَ فِي ٱلۡبَحۡرِ بِأَمۡرِهِۦۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلۡأَنۡهَٰرَ ٣٢ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَآئِبَيۡنِۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ ٣٣ وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلۡتُمُوهُۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحۡصُوهَآۗ﴾ [ابراهيم: ٣٢، ٣٤]

“আল্লাহ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ করে তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। তিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে এটি সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি ও দিবসকে। আর তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ তার প্রতিটি হতে তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ৩২-৩৪]

৬. অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিবারগুলো সঠিক দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»

“প্রত্যেক নবজাতক ফিৎরাত তথা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদি অথবা নাসারা কিংবা মাজুসি তথা অগ্নিউপাসকে পরিণত করে।”[4]

সুতরাং শিশুর ঝোঁক, প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নে বাবা-মায়ের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

৭. ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যমগুলো তাদের দায়িত্ব আদায় থেকে দূরে থেকেছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারিক্যুলাম ও শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যাপারটিকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। অথবা তার প্রতি আদৌ কোনো গুরুত্বই থাকে না। আর অডিও-ভিজুয়াল ও পঠন উপযোগী প্রচার মাধ্যমসমূহসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধ্বংস ও অধঃপতনের উপকরণে পরিণত হয়েছে অথবা এগুলো শুধুমাত্র বৈষয়িক ও আনন্দ-উল্লাসের ব্যাপারেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সে সব বিষয়ে কোনোই গুরুত্ব প্রদান করে না যা নৈতিকতা ও চরিত্রকে মূল্য দিয়ে থাকে এবং সহীহ আকীদার বীজ বপন করে। ফলে এদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৯২৮।

প্রজন্ম যারা নাস্তিকবাদের সৈন্যদের সামনে জ্ঞানহীন, সে লোকদের প্রতিরোধ করার মতো সামর্থ যাদের কাছে আর অবশিষ্ট নেই।

এ অধঃপতন ও ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার উপায়সমূহকে নিম্নে এভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) মহান আল্লাহর গ্রন্থ আল-কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ'র দিকে ফিরে আসা, যাতে এ উভয় উৎস থেকে সহীহ আকীদা অর্জন করা যায় যেমনিভাবে সালাফে-সালেহ তথা পূর্ববর্তী সত্যনিষ্ঠ আলিমগণ এ উৎসদ্বয় থেকে তাদের আকীদা আহরণ করতেন। আর এ উম্মতের সর্বশেষ লোকদেরকে সংশোধন শুধুমাত্র সেই বস্তুই করতে পারে যা উম্মতের প্রথম অংশকে সংশোধন করেছিল। এর পাশাপাশি জানা থাকতে হবে বিভ্রান্ত দলসমূহের আকীদা এবং তাদের সংশয়সমূহ, যেন তাদের সে সংশয়গুলো অপনোদন করা যায় এবং এ সকল দল সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করা যায়। কেননা যারা অনিষ্ট সম্পর্কে জানে না তারা সে অনিষ্টে পতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

(খ) শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে সহীহ আকীদা তথা সালাফে-সালেহীনের বিশুদ্ধ আকীদা পড়ানোর প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা, শিক্ষাক্রমের মধ্যে আকীদা বিষয়ে যথেষ্ঠ পরিমাণে পাঠদানের ঘন্টা বাড়ানো এবং এ বিষয়ে পরীক্ষার খাতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করা।

(গ) সালাফে-সালেহীনের বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহ সিলেবাসভূক্ত করা এবং সূফিয়া, বিদ‘আতী, জাহমিয়া, মু‘তাযিলা, আশ‘আরিয়া ও মাতুরিদিয়াহসহ আরো যে সব বিভ্রান্ত দলসমূহ রয়েছে তাদের গ্রন্থসমূহ সিলেবাস থেকে বাদ দেওয়া। অবশ্য এ দলসমূহ সম্পর্কে শুধু এজন্য জ্ঞানার্জন করা যেতে পারে যাতে তাদের মধ্যে যে বাতিল আকীদা রয়েছে তার জবাব দেওয়া যায় এবং তাদের সম্পর্কে সতর্ক করা যায়।

(ঘ) এমন এক দল সংস্কারক দা‘ঈ ইলাল্লাহ তৈরি হওয়া যারা মানুষের জন্য সালাফ তথা পূর্ববর্তী আলিমদের আকীদাকে নবায়ন করবে এবং সে আকীদা থেকে যারা বিচ্যুত হয়েছে তাদের বিভ্রান্তি অপনোদন করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

তাওহীদের অর্থ ও এর প্রকারভেদ

আত-তাওহীদ:

তাওহীদ হচ্ছে সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগতকে পরিচালনার কর্তৃপক্ষ হিসাবে আল্লাহকে একক বলে স্বীকার করা, তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে ইবাদাত করা, তিনি ছাড়া অন্য যে কারোর ইবাদাত পরিত্যাগ করা এবং তাঁর যে সকল সুন্দর সুন্দর নাম ও মহান গুণাবলী রয়েছে তা সাব্যস্ত করা আর তাঁকে সকল দোষ ও ত্রুটি থেকে পবিত্র ও মুক্ত রাখা। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী তাওহীদ-এর তিনটি প্রকারই এতে শামিল রয়েছে। নিচে এগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো:

1. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ
2. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ
3. তাওহীদুল আসমা ওয়াস্-সিফাত

প্রথমত: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর আলোচনা

এতে রয়েছে নিম্নবর্ণিত পরিচ্ছেদসমূহ:

প্রথম পরিচ্ছেদ: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর অর্থ এবং এটি যে মানবস্বভাবজাতপ্রসূত এবং এর প্রতি যে মুশরিকদের স্বীকৃতি ছিল তার বর্ণনা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আল-কুরআন ও আস-সুন্নায় 'আর-রব' শব্দটির অর্থ এবং রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিভ্রান্ত জাতিসমূহের ধারণা ও তার অপনোদন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: আল্লাহর আনুগত্য নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে সমস্ত জগতের বশ্যতা ও নতি স্বীকার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সৃষ্টি, জীবিকাপ্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আল-কুরআনের নীতি

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ যে অপরিহার্যভাবে তাওহীদুল উলুহিয়্যাকে শামিল করে তার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ:

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ এর অর্থ এবং এটি যে মানবস্বভাবজাতপ্রসূত এবং এর প্রতি যে মুশরিকদের স্বীকৃতি ছিল তার বর্ণনা

সাধারণ অর্থে "তাওহীদ" হচ্ছে: আল্লাহই একমাত্র রব -এ আকীদা পোষণ করে তাঁর জন্য ইবাদাতকে খালিস ও একনিষ্ঠ করা আর তাঁর সকল নামসমূহ ও সিফাতকে সাব্যস্ত করা। এ আলোকে তাওহীদ তিন প্রকার:

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহীদুল আসমা ওয়াস্-সিফাত। এসব প্রকারের প্রত্যেকটিরই একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে যা আলোচনা করা প্রয়োজন, যাতে করে এ প্রকারগুলোর মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলাকে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে একক বলে মেনে নেওয়া। যেমন, এ বিশ্বাস করা যে তি**নিই** সকল সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা।

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ﴾

"আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬২]

আর এ বিশ্বাস করা যে, তিনি সকল প্রাণী, সকল মানুষের ও অন্য সবকিছুর রিযিকদাতা।

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا﴾ [هود: ٦]

“পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপরে নেই।” [সূরা হূদ, আয়াত: ৬]

আর এ বিশ্বাস করাও যে, তিনি সকল রাজত্বের মালিক, তিনি সমগ্র জাহানের পরিচালক। তিনি শাসনক্ষমতা প্রদান করেন, ক্ষমতাচ্যুত করেন, তিনি মান ইজ্জত দান করেন আবার অপমানও করেন। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি দিবস রজনীর পরিক্রমন ঘটান। তিনি জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু দান করেন।

﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٦ تُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيۡلِۖ وَتُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَتُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّۖ وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ٢٧﴾ [ال عمران: ٢٦، ٢٧]

“বলুন, হে আল্লাহ, সার্বভৌম শক্তির মালিক! আপনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব প্রদান করেন এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নেন। যাকে ইচ্ছা পরাক্রমশালী করেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই, নিশ্চয় আপনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আপনিই রাত্রিকে দিবসে পরিণত করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন। আপনি মৃত হতে জীবন্তের উদ্ভব ঘটান আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আর আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ২৬-২৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা রাজত্ব এবং শক্তির ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরীক অথবা সহযোগী থাকাকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, যেমনিভাবে তিনি সৃষ্টিকার্যে ও রিজিকপ্রদানের ক্ষেত্রেও তার কোনো শরীক নেই বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿هَٰذَا خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ﴾ [لقمان: ١١]

“এ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে দেখাও যে, তিনি ছাড়া আর যারা রয়েছে তারা কি সৃষ্টি করেছে।” [সূরা লুকমান, আয়াত: ১১]

তিনি আরো বলেন,

﴿أَمَّنۡ هَٰذَا ٱلَّذِي يَرۡزُقُكُمۡ إِنۡ أَمۡسَكَ رِزۡقَهُۥ﴾ [الملك: ٢١]

“কে এই সত্ত্বা যে তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করছেন, যদি তিনি রিযিক প্রদান বন্ধ করে দেন?” [সূরা আল-মুলক, আয়াত: ২১]

অন্যত্র তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর তাঁর একক রুবুবিয়্যাতের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢﴾ [الفاتحة: ٢]

“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ২]

তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثِيثٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۢ بِأَمۡرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٥٤﴾ [الاعراف]

"তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের ওপর উঠেছেন। তিনি দিবসকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে এদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য-চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁরই আজ্ঞাধীন করে তিনি সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখো, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪]

আল্লাহ সৃষ্টির সকলকে এমন স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা তাঁর রুবুবিয়্যাতের স্বীকৃতি প্রদান করে। এমনকি যে সকল মুশরিক ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাঁর শরীক করত তারাও স্বীকার করত যে, তিনি একমাত্র রব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٨٧ قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ٨٩﴾ [المؤمنون: ٨٦، ٨٩]

"বল, কে সপ্ত আকাশ ও মহা আরশের রব? তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? তুমি জিজ্ঞাসা কর, তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার ওপর কোনো আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জেনে থাকো? তারা বলবে,

আল্লাহ। বল, তবুও তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্ত হচ্ছো?” [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৮৬-৮৯]

এ হচ্ছে সে তাওহীদ যার বিপরীত প্রান্তে বনী আদমের পরিচিত কোনো দলই এখনো পর্যন্ত যায় নি। বরং এ তাওহীদের প্রতি স্বীকৃতি দানের স্বভাবসূলভ তাড়না দিয়ে মানব হৃদয়কে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই জগতের অন্য কিছুর প্রতি স্বীকৃতি দানের চেয়ে তাওহীদকে স্বীকৃতি দানের তাড়না মানব হৃদয়ে স্বভাবতই অনেক বেশি অনুভূত হয়; যেমনটি আল্লাহর বাণীতে রাসূলগণের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে,

﴿۞قَالَتۡ رُسُلُهُمۡ أَفِي ٱللَّهِ شَكّٞ فَاطِرِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ﴾ [ابراهيم: ١٠]

“তাদের রাসূলগণ বলেছিল যে, আল্লাহর ব্যাপারে কি কোনো সন্দেহ আছে যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা?” [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১০]

আর যারা আল্লাহকে একমাত্র রব হিসেবে অস্বীকার করার মাধ্যমে তাকে না জানার ভান করেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ফির‘আউন। অথচ প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, সেও ভেতরে ভেতরে আল্লাহকে রব হিসেবে বিশ্বাস করত। যেমন, মূসা আলাইহিস সালাম তাকে বলেছিলেন,

﴿قَالَ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ [الاسراء: ١٠٢]

“তিনি বলেছিলেন, তুমি তো অবশ্যই জানো এসব কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের রব-ই নাযিল করেছেন।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১০২]

আল্লাহ তার সম্পর্কে এবং তার জাতি সম্পর্কে বলেছেন,

﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمٗا وَعُلُوّٗاۚ﴾ [النمل: ١٤]

“তারা অস্বীকার করেছে অথচ তাদের মন তার প্রতি বিশ্বাস রেখেছিল। এটা তারা করেছে অবিচার ও অহংকারবশত।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ১৪]

অনুরূপভাবে কমিউনিস্টদের মধ্য থেকে যারা আজ রবকে অস্বীকার করে তারা অহংকারবশতই প্রকাশ্যে তাঁকে অস্বীকার করে থাকে। তারা প্রকৃতপক্ষে গোপনে এ কথার স্বীকৃতি দেয় যে, যে কোনো অস্তিত্বশীল বস্তুর অবশ্যই একজন অস্তিত্বদানকারী রয়েছে এবং যে কোনো সৃষ্ট বস্তুরই একজন স্রষ্টা অবশ্যই রয়েছে। আর যে কোনো ক্রিয়ার একজন ক্রিয়াশীল রয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٣٥ أَمۡ خَلَقُواْ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ٣٦﴾ [الطور: ٣٤، ٣٥]

“তারা কি কোনো কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারাই স্রষ্টা? তারাই কি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করে না।” [সূরা আস-তূর, আয়াত: ৩৫-৩৬]

সমগ্র বিশ্বজগতের উপর-নিচ প্রতিটি অংশ নিয়ে চিন্তা করুন, আপনি দেখতে পাবেন একজন স্রষ্টা, একজন মালিকের অস্তিত্ব। সুতরাং বিবেক ও ফিতরাতের ক্ষেত্রে বিশ্বের স্রষ্টাকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা মূলত জ্ঞানকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করারই নামান্তর। এতদুভয়ের মধ্যে

কোনো পার্থক্য নেই।[5]

আজ কমিউনিস্টরা রবের অস্তিত্ব অস্বীকার করার ব্যাপারে যে সুর উচ্চকিত করছে এটি তারা করছে শুধুই অহংকারবশত এবং বিবেক ও সঠিক চিন্তার ফলাফল এড়িয়ে গিয়ে। যারা এ অবস্থার মধ্যে রয়েছে তারা মূলত তাদের বিবেককে অকার্যকর করে দিয়েছে এবং বিবেকের প্রতি উপহাস করার দিকে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে। কবি বলেন,

কীভাবে ইলাহকে অমান্য করা যায়?

এবং অস্বীকারকারী কিভাবে তাকে অস্বীকার করতে

পারে?

অথচ প্রতিটি বস্তুতেই রয়েছে তাঁর নিদর্শন

যা এ প্রমাণ বহন করছে যে তিনি একক।

---

[5] কেননা বিশুদ্ধ সায়েন্স বা জ্ঞান স্রষ্টার অস্তিত্বকে সাব্যস্ত করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ ও ভ্রষ্ট জাতিসমূহের ধারণায় ‘আর-রব’ শব্দটির অর্থ

১. আল-কুরআন ও আস-সুন্নায় ‘আর-রব’ শব্দটির অর্থ:

‘আর-রাব’ মূলে ‘রাববা’, ‘ইয়ারুববু’ এর ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হচ্ছে কোনো বস্তুকে প্রতিপালন করে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় তথা পূর্ণ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া। আরবীতে বলা হয়, ‘রববাহু, ওয়া-রাববা-হু, ওয়া-রাববাবাহু’। সুতরাং ‘রব’ শব্দটি কর্তৃকারকের জন্য ব্যবহৃত একটি ক্রিয়ামূল। ‘আর-রাববু’ শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য, যিনি জগতের সকল কিছুর জন্য যা মঙ্গলজনক তার জিম্মাদার। তিনি ছাড়া আর কারোর জন্যই এটা বলা যাবে না, যেমন আল্লাহর বাণী,

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢﴾ “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টিকুলের রব।” [সূরা আল-ফাতিহা, আয়াত: ২]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٢٦﴾ “আল্লাহ তোমাদের রব এবং তোমাদের বাপ-দাদাদের রব।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ২৬]

আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য এ শব্দটি সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধবাচক শব্দ হিসেবে হলেই শুধু বলা যাবে। যেমন বলা হয়, ‘রাববুদ্দার’ অর্থাৎ ঘরের মালিক ও ‘রাববুল ফারাস’ অর্থাৎ ঘোড়ার মালিক। এ অর্থেই আল্লাহ তা‘আলার

নিম্নোক্ত বাণীতে ইউসুফ আলাইহিস সাল্লামের বক্তব্য পেশ হয়েছে বলে আয়াতের তাফসীরের মধ্যে একটি মত রয়েছে।

﴿ٱذۡكُرۡنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ ذِكۡرَ رَبِّهِۦ﴾ [يوسف: ٤٢]

"তুমি তোমার রবের কাছে আমাকে স্মরণ করো, কিন্তু শয়তান তার মালিকের কাছে তার কথা স্মরণ করতে তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪২]

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী, ﴿قَالَ ٱرۡجِعۡ إِلَىٰ رَبِّكَ ۝٥٠﴾ [يوسف] "তিনি বললেন তুমি তোমার পালনকারীর কাছে ফিরে যাও।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৫০]

আল্লাহ তা'আলার আরেক বাণী হচ্ছে,

﴿أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسۡقِي رَبَّهُۥ خَمۡرٗاۖ﴾ [يوسف: ٤١] "তোমাদের একজন তার পালনকারীকেকে শরাব পান করাবে।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৪১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিয়ে যাওয়া উষ্ট্রী সম্পর্কে বলেছিলেন, حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا অর্থাৎ যতক্ষণ না উষ্ট্রীর রব তাকে ফিরে পায়।[6]

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে আল্লাহর ক্ষেত্রে *'আর-রব'* সুনির্দিষ্ট বিশেষ্যপদ ও সম্বন্ধবাচক পদ হিসেবে উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে। সুতরাং এভাবে বলা যেতে পারে: 'আর-রব' অথবা 'রাববুল

---

[6] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৯৯।

‘আলামীন’ অথবা ‘রাববুন্নাস’। তবে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে ‘আর-রব’ বলা যাবে না। অবশ্য শব্দটিকে অন্যদের ক্ষেত্রে সম্বন্ধবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন, ‘রাববুল মানযিল’ অর্থাৎ বাড়ির মালিক, ‘রাব্বুদ্দার’ অর্থাৎ ঘরের মালিক, ‘রাববুল ইবিল’ অর্থাৎ উটের মালিক।

আর রাববুল আলামীন কথাটির অর্থ হচ্ছে, তাদের স্রষ্টা ও মালিক, তাদের সংশোধনকারী এবং বহু নিয়ামত দিয়ে, রাসূলদেরকে পাঠিয়ে ও গ্রন্থসমূহ নাযিল করে তাদের প্রতিপালনকারী এবং তাদের আমলের পুরস্কার দানকারী। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, “রুবুবিয়্যাহ কথাটির দাবী হলো বান্দাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা, তাদেরকে নিষেধ করা এবং বান্দাদের যারা সৎ তাদেরকে এহসান দিয়ে পুরস্কৃত করা ও যারা পাপী তাদেরকে পাপের সাজা দেওয়ার ক্ষমতা প্রয়োগ।”[7]

২. ভ্রষ্টজাতিসমূহের ধারণায় ‘আর-রব’ শব্দটির অর্থ:

আল্লাহ সৃষ্টিকূলকে তাওহীদের প্রতি স্বভাবসুলভ আকর্ষণ ও মহান রব তথা স্রষ্টার পরিচিতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفٗاۚ فِطۡرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيۡهَاۚ لَا تَبۡدِيلَ لِخَلۡقِ ٱللَّهِۚ﴾ [الروم: ٣٠]

[7] মাদারেজুস সালেকীন: ১/৮।

“অতএব, তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করো। (এ-দীন-টি) আল্লাহর ফিতরাত, যা অনুযায়ী তিনি মানবকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَإِذۡ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَأَشۡهَدَهُمۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡۖ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدۡنَآۚ ﴾ [الاعراف: ١٧١]

“আর স্মরণ কর তোমার রব আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তার বংশধরদেরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৭২]

সুতরাং আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান এবং তার প্রতি মনোনিবেশ একটি স্বভাবজাত বিষয়। আর শির্ক হচ্ছে একটি আরোপিত বা আপতিত ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ»

“প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাত তথা ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইয়াহুদি অথবা নাসারা কিংবা মাজুসি তথা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে।”[8]

অতএব, বান্দাকে যদি তার স্বভাবজাত ফিতরাতসহ ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সে তাওহীদ অভিমূখী হবে এবং রাসূলগণের দাওয়াতকে গ্রহণ করবে। এ তাওহীদ নিয়েই আগমন করেছেন রাসূলগণ, নাযিল হয়েছে সকল আসমানী গ্রন্থ আর এর ওপর প্রমাণ বহন করছে জাগতিক বহু নিদর্শন। কিন্তু বিচ্যুত তারবিয়াত ও শিক্ষা এবং নাস্তিকবাদী পরিবেশ-এদু’টো নবজাতকের দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তন করে দেয়। আর সেখান থেকেই সন্তানরা ভ্রষ্টতা ও বক্রতায় তাদের বাবা-মায়ের অন্ধ অনুকরণ করে থাকে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

«وَإِنِّ خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ»

“আমি আমার বান্দাদের সকলকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের কাছে এসে তাদেরকে তাদের দীন থেকে সরিয়ে দেয়”[9]

অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে প্রতিমাসমূহের ইবাদাতের প্রতি ফিরিয়ে দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া আরো অনেক রব গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে;

---

[8] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৯২৮।

[9] হাদীসটি ইমাম আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

যার ফলে তারা ভ্রষ্টতা, ধ্বংস, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্যে পতিত হয়। তাদের প্রত্যেকেই, অন্যের গ্রহণ করা রব বাদ দিয়ে নিজের জন্য এমন এক রব গ্রহণ করে যার সে ইবাদাত করে। কেননা তারা যখন সত্যিকার রবকে পরিত্যাগ করেছে তখন বাতিল রবদেরকে গ্রহণ করার মুসীবতে তারা নিপতিত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلۡحَقُّۖ فَمَاذَا بَعۡدَ ٱلۡحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُۖ﴾ [يونس: ٣٢]

"তিনি আল্লাহ তোমাদের সত্য রব। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কি থাকে?" [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩২] আর বিভ্রান্তির কোনো সীমানা বা শেষ নেই। যারাই তাদের প্রকৃত রব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অপরিহার্যভাবে বিভ্রান্তি বিরাজ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ءَأَرۡبَابٞ مُّتَفَرِّقُونَ خَيۡرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّارُ ٣٩ مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسۡمَآءٗ سَمَّيۡتُمُوهَآ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلۡطَٰنٍۚ﴾ [يوسف: ٣٩، ٤٠]

"ভিন্ন ভিন্ন বহু রব শ্রেয় নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতগুলো নামের ইবাদাত করছ যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখেছো। এগুলোর কোনো প্রমাণ আল্লাহ নাযিল করেন নি।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩৯-৪০]

গুণাবলী ও কর্মের ক্ষেত্রে দু'জন সমকক্ষ স্রষ্টা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শির্ক করা মূলতঃ অসম্ভব। তবে কতিপয় মুশরিকের মতামত হলো, তাদের উপাস্যগণ জগতের কোনো কোনো

ক্ষেত্রে তাসাররুফ তথা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অধিকার রাখে। মূলত এ সকল উপাস্যের উপাসনার ব্যাপারে শয়তান তাদেরকে নিয়ে একটি খেলায় মেতে উঠেছে এবং প্রত্যেক জাতির সাথে শয়তান তাদের বুদ্ধি বিবেকের কম-বেশ অনুসারে খেল তামাশা করেছে। একদলকে শয়তান এসকল উপাস্যের ইবাদাতের দিকে আহ্বান করেছে মৃতদেরকে সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে, যারা সে সকল প্রতিমাকে এ সব মৃত লোকের ছবি অনুযায়ী সাজিয়েছে, যেমন নূহ এর জাতি। আরেকদল নক্ষত্র ও গ্রহের আকার দিয়ে প্রতিমাগুলোর পুজো করছে। তাদের ধারণা এসব নক্ষত্র ও গ্রহ বিশ্বজগতের ওপর ক্রিয়াশীল। তাই তারা এসব প্রতিমার জন্য ঘর ও সেবক তৈরি করেছে।

এসকল গ্রহ-নক্ষত্রের ইবাদাত নিয়ে তারা নিজেরাও মতভেদে লিপ্ত হয়েছে। তাদের কেউ সূর্যের ইবাদাত করে আর কেউ করে চন্দ্রের ইবাদাত। কেউ আবার চন্দ্র-সূর্য বাদ দিয়ে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের ইবাদাত করে থাকে। এমনকি তারা সেসব গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতিকৃতিও বানিয়ে নিয়েছে। প্রতিটি গ্রহের জন্য রয়েছে একটি বিশেষ প্রতিকৃতি। এ সব পূজারীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার অগ্নিপূজাও করে থাকে, তারা হচ্ছে মাজূস। তাদের কেউ আবার গাভীর পূজা করে থাকে, যেমন ভারতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে অনেকে মালাঈকা তথা ফিরিশতাদের পূজা করে থাকে। অনেকে আবার বৃক্ষ ও পাথরের পূজা করে থাকে। তাদের অনেকে কবর এবং কবরের ওপর যে সৌধ স্থাপন করা হয় সেগুলোর ইবাদাত করে থাকে। এর কারণ হলো এসকল বস্তুর মধ্যে রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের কিছু অংশ আছে বলে তারা ধারণা করে।

এদের একদল এ ধারণা পোষণ করে যে, এ সকল প্রতিমা অদৃশ্য ও গায়েবী কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে। ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, “প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য উপাস্যের প্রতিকৃতিতেই প্রতিমা তৈরি করা হয়েছিল। তারা প্রতিমাকে অদৃশ্য উপাস্যের প্রতিকৃতি, অবস্থা ও ছবি অনুযায়ী তৈরি করেছে যাতে এ প্রতিমা সে অদৃশ্য উপাস্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। নতুবা এটাতো সকলেরই জানা যে, কোনো বিবেকবান তার নিজের হাতে একটি কাষ্ঠখন্ড অথবা পাথরকে খোদাই করে এ আকীদা পোষণ করতে পারে না যে, সে তার ইলাহ বা উপাস্য... ... ... ।”[10]

অনুরূপভাবে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের কবরপূজারীগণ ধারণা করে থাকে যে, এ সকল মৃত ব্যক্তিগণ তাদের জন্য শাফায়াত করবে এবং তাদের অভাব পূরণে ও হাজত পূরণে আল্লাহর কাছে তাদের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবে। তাদের বক্তব্য আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন এভাবে,

﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ﴾ [الزمر: ٣]

“আমরা এদের ইবাদাত তো এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩]

﴿وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ ﴾ [يونس: ١٨]

[10] ইগাসাতুল লাহফান ২/২২০।

“আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদাত করে থাকে, যা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তাদের কোনো কল্যাণও সাধন করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা‘আতকারী।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১৮]

অনুরূপভাবে আরবের কতিপয় মুশরিক এবং খৃষ্টানগণ তাদের মা‘বুদ ও উপাস্যের ব্যাপারে ধারণা করত যে, এরা আল্লাহর সন্তান। আরবের মুশরিকরা ফিরিশতাদের ইবাদাত করত এ বিশ্বাসে যে, এরা আল্লাহর কন্যা। আর খৃষ্টানগণ মাসীহ আলাইহিস সাল্লামের ইবাদাত করত এ বিশ্বাসে যে, তিনি আল্লাহর পুত্র।

৩. এসব বাতিল ধারণার অপনোদন:

নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা এসকল বাতিল ধারণা অপনোদন করেছেন।

(ক) যারা প্রতিমাপূজারী তাদের অপনোদন করা হয়েছে আল্লাহর এ বাণী দিয়ে:

﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۝١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۝٢٠﴾ [النجم: ١٩، ٢٠]

“তোমরা কি দেখেছ লাত ও উজ্জাকে এবং তৃতীয় আরেকটি-মানাতকে?” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ১৯-২০]

আয়াতটির অর্থের ব্যাখ্যায় কুরতুবী বলেছেন, “তোমরা কি এসকল উপাস্যদেরকে অবলোকন করেছ! এরা কি কোনো কল্যাণ সাধন করেছে অথবা ক্ষতি করেছে, যার ফলে এরা মহান আল্লাহর শরীক হতে পারে?

অথবা তারা কি নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছিল যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম) এগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলেন ও ধ্বংস করেছিলেন?

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ إِبۡرَٰهِيمَ ٦٩ إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِۦ مَا تَعۡبُدُونَ ٧٠ قَالُواْ نَعۡبُدُ أَصۡنَامٗا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ٧١ قَالَ هَلۡ يَسۡمَعُونَكُمۡ إِذۡ تَدۡعُونَ ٧٢ أَوۡ يَنفَعُونَكُمۡ أَوۡ يَضُرُّونَ ٧٣ قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ ٧٤﴾ [الشعراء: ٦٩، ٧٤]

“এদের কাছে ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা কর। সে যখন তার পিতা ও জাতিকে বলেছিল তোমরা কিসের ইবাদাত করো? তারা বলল, আমরা মূর্তিপূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথে এদের পূজায় নিরত থাকব। সে বলল, তোমরা প্রার্থনা করলে ওরা কি শোনে? অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে? তারা বলল, না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছিলাম।” [সূরা আশ-শুয়ারা, আয়াত: ৬৯-৭৪]

তারা এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, এ সকল মূর্তি ও প্রতিমাসমূহ কোনো দো‘আ ও আহ্বান শুনতে পায় না। তারা কল্যাণ সাধন করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না। তারা শুধু তাদের পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুকরণেই এগুলোর ইবাদাত করত বা পূজা করত। আর অন্ধ অনুকরণ একটি বাতিল দলীল।

(খ) যারা গ্রহ-সূর্য ও চন্দ্রের পূজা করত আল্লাহ তাদের জবাব দিয়েছেন নিম্নের বাণী দ্বারা,

﴿وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۭ بِأَمۡرِهِۦٓۗ﴾ [الاعراف: ٥٣]

"আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৫৪]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيۡلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُۚ لَا تَسۡجُدُواْ لِلشَّمۡسِ وَلَا لِلۡقَمَرِ وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ٣٧﴾ [فصلت: ٣٧]

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত-দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য ও চন্দ্রের উদ্দেশ্যে সাজদাহ করো না বরং সাজদাহ করো সেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে যিনি এ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করে থাক।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩৭]

(গ) যারা ফিরিশতা ও মাসীহ আলাইহিস সাল্লামের পূজা করত তাদেরকে আল্লাহর সন্তান মনে করে, আল্লাহ তাদের বক্তব্য অপনোদন করেছেন তাঁর এই বাণী দিয়ে:

﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ﴾ [المؤمنون: ٩١] "আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি।" [সূরা আল মুমিনূন, আয়াত: ৯১]

তাঁর আরো বাণী: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَمۡ تَكُن لَّهُۥ صَٰحِبَةٞۖ﴾ [الانعام: ١٠١]
“তাঁর সন্তান কীভাবে হতে পারে অথচ তাঁর কোনো স্ত্রী ছিল না?” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১০১]

তিনি আরো বলেন:

﴿لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾ [الاخلاص: ٣، ٤]

“তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়।” [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ৩-৪]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

আল্লাহর আনুগত্য ও নির্দেশ মানার ক্ষেত্রে সমস্ত জগতের বশ্যতা ও নতি স্বীকার

নিশ্চয় পুরো বিশ্বজগত -যাতে রয়েছে আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, প্রাণীকূল, বৃক্ষ এবং জল-স্থল ও অন্তরীক্ষ, মালাঈকা, জিন্ন ও ইনসান...এর সবকিছুই আল্লাহর বশীভূত ও তাঁর জাগতিক নির্দেশের অনুগত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا﴾ [ال عمران: ٨٣]

"আকাশমণ্ডলী ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সকলেই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৩]

তিনি আরো বলেন,

﴿بَل لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ١١٦﴾ [البقرة: ١١٦]

"বরং আকাশমণ্ডলী ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সব তাঁরই অনুগত।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১১৬]

﴿وَلِلَّهِ يَسۡجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن دَآبَّةٖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَهُمۡ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ٤٩﴾ [النحل: ٤٩]

“আর আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সাজদাহহ করছে যা কিছু রয়েছে আকাশমণ্ডলীতে এবং যেসকল প্রাণী রয়েছে যমীনে, আর মালাঈকাগণ যারা কখনো অহংকার করে না।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৪৯]

﴿أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسۡجُدُۤ لَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلۡجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٞ مِّنَ ٱلنَّاسِۖ﴾ [الحج: ١٨]

“তুমি কি দেখো না আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাজদাহ করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও যা কিছু আছে যমীনে এবং সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজী, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং সাজদাহ করে মানুষের মধ্যে অনেকে?” [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ১৮]

﴿وَلِلَّهِ يَسۡجُدُۤ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَظِلَٰلُهُم بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ۩ ١٥﴾ [الرعد: ١٥]

“আল্লাহর জন্যই আকাশমণ্ডলী ও যমীনের সব কিছু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সাজদাবনত হয় এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের ছায়াগুলোও।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ১৫]

সুতরাং এ সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতসমূহের সবকিছুই আল্লাহর অনুগত ও তাঁর ক্ষমতার কাছে বশীভূত। এগুলো আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী এবং তাঁর নির্দেশক্রমে পরিচালিত হয়। এর কোনো কিছুই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। অতি সুক্ষ্ম নিয়ম ও শৃঙ্খলার সাথে তারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে এবং অনিবার্য ফলাফলে উপনীত হয় আর নিজেদের স্রষ্টাকে সকল দোষ, ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে পবিত্র বলে ঘোষণা করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَٰوَٰتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهِنَّۚ وَإِن مِّن شَيۡءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ﴾ [الاسراء: ٤٤]

“সপ্ত আকাশ, যমীন এবং এ সকলের অন্তবর্তী সকল কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পারো না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৪৪]

সুতরাং নীরব ও সরব, জীবিত ও মৃত, এ সৃষ্টিজগতের সবকিছুই আল্লাহর অনুগত। তাঁর জাগতিক নির্দেশের অনুসারী। এসব কিছুই তাদের বাস্তব অবস্থা ও বক্তব্যের ভাষায় সকল দোষ-ত্রুটি ও অক্ষমতা থেকে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে। কোনো বিবেকবান ব্যক্তি যখনই এ সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে সে জানতে পারবে যে, এগুলো সত্যসহকারে এবং সত্যের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। আর এগুলো তাদের প্রতিপালকের নির্দেশমত পরিচালিত হয়, তাঁর নির্দেশ অমান্য করা ও তা থেকে পিছপা হওয়ার কোনো অপচেষ্টা এদের মধ্যে নেই। সকলেই স্বভাবজাত তাড়নায় তাদের স্রষ্টার স্বীকৃতি প্রদান করছে।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহেমাহুল্লাহ বলেন,”তারা অনুগত ও

আত্মসমর্পণকারী এবং স্বপ্রণোদিতভাবে বশীভূত হতে বাধ্য কয়েক দিক থেকেঃ

এক. তারা স্রষ্টার প্রতি তাদের হাজত, প্রয়োজন, উপযোগিতা ও জরুরত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে।

দুই. আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর ও ইচ্ছা যে তাদের ওপর জারী হচ্ছে, বিনয়ের সাথে তারা তা মেনে নেয় এবং তার প্রতি আত্মসমর্পণ করে।

তিন. বিপদে-আপদে তারা আল্লাহর কাছেই দো'আ করে থাকে।

মুমিন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার রবের নির্দেশের অনুগত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত তাকদীরের লিখন অনুযায়ী যে সকল বালা-মুসীবত তার ওপর আপতিত হয় তা সে মেনে নেয়। কেননা সে বালা-মুসীবতের সময় স্বেচ্ছায় সবর ও অন্যান্য যেসব নির্দেশ তাকে করা হয়েছিল তা পালন করে থাকে। অতএব, সে স্বেচ্ছায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী এবং স্বেচ্ছায় সে আল্লাহর অনুগত।[11]

আর কাফির ব্যক্তি তার রবের জাগতিক নির্দেশ মেনে নিয়ে থাকে। জগতের সকল কিছুর সাজদাহ বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, অনুগত থাকা। প্রত্যেক বস্তুর সাজদাহ সে বস্তু অনুপাতেই হয়ে থাকে যা তার জন্য উপযোগী। মহান রাববুল আলামীনের অনুগত হওয়া এ সাজদাহর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেক বস্তুর তাসবীহ পাঠ সে বস্তু অনুসারেই ধরে নিতে হবে প্রকৃত অর্থে, রূপক অর্থে নয়।

---

[11] মাজমু আল ফাতাওয়া: ১/৪৫।

আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿أَفَغَيۡرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبۡغُونَ وَلَهُۥٓ أَسۡلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ طَوۡعٗا وَكَرۡهٗا وَإِلَيۡهِ يُرۡجَعُونَ ۝٨٣﴾ [ال عمران: ٨٣]

“তারা কি আল্লাহর দীন ব্যতীত অন্য কিছু অনুসন্ধান করছে? অথচ আল্লাহরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং তাঁর কাছেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৩]

এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় শায়খুল ইসলাম তাইমিয়্যা রহ. বলেন, “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সৃষ্টিজগতের আত্মসমর্পণের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। কেননা সৃষ্টিজগতের সবকিছুই পরিপূর্ণভাবে তাঁরই ইবাদাত করে থাকে, চাই কোনো স্বীকৃতিদানকারী এর স্বীকৃতি দান করুক কিংবা তা অস্বীকার করুক। তারা তাঁর কাছে ঋনী, তাঁর দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং তারা স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী। আল্লাহ যা চেয়েছেন, যা তাকদীরে নির্ধারিত করেছেন এবং যে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টিজগতের কারো পক্ষেই তা থেকে বের হওয়ার সাধ্য নেই। আর তিনি ছাড়া কারো কোনো শক্তি ও সামর্থও নেই। তিনি সৃষ্টির সকলের রব, তাদের মালিক। তিনি যেমন ইচ্ছা তাদেরকে পরিচালিত করেন। তিনি তাদের প্রত্যেকের স্রষ্টা, তাদের অস্তিত্বদানকারী এবং তাদের অবয়বদানকারী। তিনি ছাড়া আর যা কিছু আছে সবই তাঁর অধিনস্ত, তাঁর সৃষ্ট ও তৈরিকৃত, তাঁর দেওয়া বৈশিষ্টমণ্ডিত, তাঁর মুখাপেক্ষী, তাঁর

অনুগত, তাঁর কাছে পর্যদুস্ত। আর তিনি পবিত্র ও মহান একক সত্ত্বা, পরাক্রমশালী স্রষ্টা, সৃষ্টিকারী এবং অবয়বপ্রদানকারী।[12]

[12] মাজমু আল ফাতাওয়া: ১০/২০০।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদ প্রমাণে আল-কুরআনের নীতি

স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদ প্রমাণে আল-কুরআনের নীতি সঠিক ফিতরাত ও স্বভাব এবং সুস্থ বিবেকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর এ নীতি বাস্তবায়িত হয়েছে এমন বিশুদ্ধ প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে যদ্বারা বিবেক সম্পন্ন সকল মানুষ সন্তুষ্ট হয় এবং প্রতিপক্ষ তা মেনে নেয়। এ সকল বিশুদ্ধ প্রমাণের মধ্যে রয়েছে:

১. এটা সবারই জরুরী জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত যে, প্রত্যেক ঘটনার পেছনে অবশ্যই একজন ঘটনাসৃষ্টিকারী রয়েছে। এটি সর্বজনগ্রাহ্য ও জরুরীভাবে ফিতরাত দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয়। এমনকি বিষয়টি শিশুদের কাছেও বোধগম্য। কোনো শিশুকে যদি কোনো প্রহারকারী প্রহার করে এবং শিশুটি প্রহারকারীকে দেখতে না পায় তবে সে অবশ্যই প্রশ্ন করবে, কে আমাকে মেরেছে? যদি তাকে বলা হয় তোমাকে কেউই প্রহার করে নি তখন তার বিবেক একথা গ্রহণ করবে না যে, কোনো ধরনের ঘটনা প্রবাহ সৃষ্টিকারী ছাড়াই প্রহারের ঘটনাটি ঘটেছে। যদি তাকে বলা হয়, অমুক তোমাকে মেরেছে, সে কাঁদতে থাকবে যতক্ষণ না তার প্রহারকারীকে প্রহার করা হয়। এজন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন

﴿أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ ٣٥﴾ [الطور: ٣٤]

“তাদেরকে কি সৃষ্টি করা হয়েছে কোনো কিছু ছাড়াই, নাকি তারাই সৃষ্টিকারী?” [সূরা আত-তূর, আয়াত: ৩৫]

এটি একটি সুনির্দিষ্ট বন্টন যা আল্লাহ তা'আলা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক প্রশ্নবোধক শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন একথা বর্ণনা করার জন্য যে, এ ভূমিকাটুকু অবশ্যম্ভাবীভাবে সর্বজনবিদিত, কারো পক্ষেই একে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, "তারা কি তাদেরকে সৃষ্টিকারী কোনো স্রষ্টা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে?" দু'টো বিষয়ের প্রত্যেকটিই বাতিল ও অশুদ্ধ। অতএব, এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তাদের অবশ্যই এমন একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ সুবহানাহু। তিনি ছাড়া আর কোনো স্রষ্টা নেই। তিনি বলেছেন,

﴿هَٰذَا خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ﴾ [لقمان: ١١]

"এ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং আমাকে দেখাও তিনি ছাড়া আর যেসব সত্ত্বা রয়েছে তারা কি সৃষ্টি করেছে?" [সূরা লুকমান, আয়াত: ১১]

﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [الاحقاف: ٤]

"আমাকে দেখাও যে তারা যমীন থেকে কি সৃষ্টি করেছে?" [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৪]

﴿أَمۡ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلۡقِهِۦ فَتَشَٰبَهَ ٱلۡخَلۡقُ عَلَيۡهِمۡۚ قُلِ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ ٱلۡوَٰحِدُ ٱلۡقَهَّٰرُ ١٦﴾ [الرعد: ١٦]

"নাকি তারা আল্লাহর জন্য এমন সব শরীক স্থির করে রেখেছে যারা তাদেরকে সৃষ্টি করেছে যেভাবে তিনি সৃষ্টি করেন, ফলে তাদের কাছে

উভয় সৃষ্টি এক রকম হয়ে গিয়েছে? বল, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি একক, পরাক্রমশালী।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ১৬]

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ﴾ [الحج: ٧٣]

“নিশ্চয় যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কিছুকে আহ্বান করে, তারা সম্মিলিত হয়েও কখনোই একটি মাছিকেও সৃষ্টি করতে পারবে না।” [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৭৩]

﴿وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ٢٠﴾ [النحل: ٢٠]

“যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কিছুকে আহ্বান করে তারা কোনো কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ২০]

﴿أَفَمَن يَخۡلُقُ كَمَن لَّا يَخۡلُقُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٧﴾ [النحل: ١٧]

“যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি ঐ বস্তুর ন্যায় যা সৃষ্টি করে না? তবু কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করছো না?” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১৭]

বার বার দেওয়া এ চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি কেউই এ দাবী করে নি যে, সে কোনো কিছু সৃষ্টি করেছে। বরং কোনো প্রমাণ সাব্যস্ত করা তো দূরে থাকুক, শুধুমাত্র এ দাবীর উত্থাপনও কেউ করে নি। ফলে এটা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহুই হচ্ছেন একমাত্র স্রষ্টা। তাঁর কোনো শরীক নেই।

২. **সারা জাহানের সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনা** হলো এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় দলীল যে, এর পরিচালক একজন মাত্র ইলাহ, একজনই রব, যার কোনো শরীক নেই, নেই কোনো বিবাদীও। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٖ وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنۡ إِلَٰهٍۚ إِذٗا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِۭ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ﴾ [المؤمنون: ٩١]

"আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে কোনো অন্য ইলাহও নেই। যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৯১]

সুতরাং সত্যিকার ইলাহ এমন এক স্রষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয় যিনি হবেন কর্মবিধায়ক। যদি তাঁর সাথে আর কোনো ইলাহ থেকে থাকে যিনি তাঁর রাজত্বে তাঁর সাথে শরীক - আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান -, তাহলে অবশ্যই সে ইলাহেরও সৃষ্টিকাজ ও অন্যান্য কাজ থাকবে। যদি সত্যি এমন হয় তাহলে তাঁর সাথে অন্য ইলাহের শরীকানা তাঁকে খুশি করবে না বরং তিনি যদি তাঁর শরীককে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন এবং একাই রাজত্ব ও ইলাহিয়্যাতের মালিক হতে পারেন তবে তিনি তাই করবেন। আর যদি তা করতে অসমর্থ হন তাহলে তিনি রাজত্ব ও সৃষ্টিতে নিজের অংশ নিয়েই একাকী পড়ে থাকবেন যেভাবে দুনিয়ার বাদশাহরা নিজ নিজ রাজত্ব নিয়ে অন্যদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে আছেন। এমতাবস্থায় জগতে বিভক্তি দেখা দেবে। সুতরাং পুরো অবস্থাটি তিন অবস্থার একটি অবশ্যই হবে:

ক. হয় একজন অন্যজনের ওপর বিজয়ী হবে এবং সকল মালিকানার অধিকারী হবে।

খ. অথবা তাদের প্রত্যেকেই একে অন্য থেকে পৃথক হয়ে নিজ নিজ রাজত্ব ও সৃষ্টি নিয়ে থাকবে ফলে জগত বিভক্ত হবে।

গ. অথবা তাদের উভয়ে একজন মালিকের অধীনস্থ থাকবে যিনি তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা তাই করবেন। তিনিই হবেন প্রকৃত ইলাহ এবং তারা হবে তাঁর বান্দা।

এ শেষোক্ত কথাটিই হচ্ছে মূল বাস্তবতা। কেননা জগতে কোনো বিভক্তি নেই এবং কোনো ত্রুটিও নেই। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় জগতের পরিচালনাকারী একজনই এবং তাঁর কোনো বিবাদী নেই এবং তিনিই একমাত্র মালিক, তাঁর কোনো শরীক নেই।

৩. সৃষ্টিজগতকে তার দায়িত্ব আদায় ও কর্তব্য পালনে অনুগত রাখা।

এ জগতে এমন কোনো সৃষ্ট বস্তু নেই যা তার দায়িত্ব পালনকে অস্বীকার করে ও তা থেকে বিরত থাকে। মূসা আলাইহিস সাল্লাম এ বিষয়টি দিয়েই প্রমাণ পেশ করেছিলেন যখন ফেরআউন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَٰمُوسَىٰ ٤٩﴾ [طه: ٤٩] “ফির‘আউন বলল, হে মূসা! তোমাদের রব কে?” [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৪৯] মূসা আলাইহিস সাল্লাম একটি পরিপূর্ণ জবাব দিয়ে বলেছিলেন,

﴿رَبُّنَا ٱلَّذِيٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَيۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠﴾ [طه: ٥٠]

“‘আমাদের রব হচ্ছেন সেই সত্ত্বা, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে হিদায়াত দিয়েছেন।” [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৫০]

এর অর্থ হচ্ছে আমাদের প্রভূ হচ্ছেন সেই সত্ত্বা যিনি সকল সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুকে তার উপযুক্ত অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, চাই সেটা দেহের বড়ত্ব-ছোটত্ব বা মধ্যম অবয়ব হোক ও অন্যান্য গুণাবলী সংক্রান্তই হোক। অতঃপর প্রত্যেক সৃষ্টিকে যে জন্য সৃষ্টি করেছেন সে দিকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর এ হিদায়াত হচ্ছে পথনির্দেশমূলক ও জ্ঞানগত হিদায়াত। আর এ হিদায়াতই সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে দেখা যায়। অতএব, প্রত্যেক মাখলুক সেজন্যই চেষ্টা করে যে কল্যাণের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার থেকে যাবতীয় অনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করে থাকে। এমনকি আল্লাহ জীবজন্তুকেও উপলব্ধি ও অনুভূতি শক্তি দান করেছেন যা দ্বারা সে নিজের উপকারী কাজ করতে সক্ষম হয় এবং তার জন্য যা ক্ষতিকর তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়। আর যা দ্বারা সে তার জীবনে প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿ٱلَّذِيٓ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُۥۖ﴾ [السجدة: ٧]

“যিনি সব কিছুকে সুন্দর অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ৭]

সুতরাং যিনি সমস্ত মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এ সকল সৃষ্টিকে সুন্দর অবয়ব দান করেছেন যে সুন্দর অবয়বের ওপর বিবেক কোনো আপত্তি উপস্থাপন করতে পারে না। আর এসব কিছুকেই তাদের

কল্যাণের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত রব। তাকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বাস্তব ও সবচেয়ে বড় সত্ত্বাকে অস্বীকার করা। আর এটি হচ্ছে বড় ধরনের অহংকার ও স্পষ্ট মিথ্যাবাদিতা। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সকলকে সবকিছু দান করেছেন, দুনিয়ায় যার প্রয়োজন তাদের রয়েছে। তারপর তাদেরকে সে সব বস্তু দ্বারা কল্যাণ অর্জনের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি সকল প্রকার বস্তুকে তার উপযোগী আকৃতি ও অবয়ব দান করেছেন, পারস্পরিক বিবাহ-মিলন ও ভালোবাসায় প্রত্যেক জাতের নর-নারীকে তার উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন। আর প্রত্যেক অঙ্গকে তার ওপর অর্পিত কাজের উপযোগী আকৃতি প্রদান করেছেন। এসবকিছুর মধ্যেই সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় ও সন্দেহমুক্ত এ প্রমাণ রয়েছে যে, মহান আল্লাহ তা'আলাই সবকিছুর রব। তিনিই একমাত্র ইবাদাতের অধিকারী, অন্য কিছু নয়। কবি বলেন,

সবকিছুর মধ্যেই রয়েছে তাঁর একটি নিদর্শন

যা প্রমাণ করে যে তিনি এক।

আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সৃষ্টিকাজে মহান আল্লাহ সুবহানাহুর একক রুবুবিয়্যাত প্রমাণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত ওয়াজিব হওয়ার ওপর প্রমাণ পেশ করা, যার কোনো শরীক নেই। একে বলা হয় তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ। সুতরাং কোনো মানুষ যদি তাওহীদুর রুবুবিয়্যার প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে কিন্তু তাওহীদুল উলুহিয়্যাহকে সে অস্বীকার করে অথবা সঠিক ও বিশুদ্ধ পন্থায়

তাওহীদুল উলুহিয়্যার স্বীকৃতি আদায় না করে, তবে সে মুসলিম হবে না এবং সে তাওহীদপন্থী বলেও স্বীকৃতি পাবে না বরং সে বিবেচিত হবে অস্বীকারকারী কাফিররূপে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এ সম্পর্কেই আলোচনা করব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:

উলুহিয়্যাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদ মেনে নেওয়ার অপরিহার্য্য দাবী

এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ তথা রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়। যেমন, সে এ স্বীকৃতি প্রদান করে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া জগতের কোনো স্রষ্টা নেই, রিযিকদাতা নেই, পরিচালনাকারী নেই, তার জন্য এ স্বীকৃতি দেওয়াও অপরিহার্য্য হয়ে উঠে যে, সকল প্রকার ইবাদাতের হক্বদার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। আর এটিই হলো তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ তথা ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা। কেননা উলুহিয়্যাতের অর্থ হচ্ছে ইবাদাত। আর 'ইলাহ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে মা'বুদ বা উপাস্য। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আহ্বান করা যাবে না, কারো কাছে দো'আ করা যাবে না, আল্লাহর কাছে ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে না। তাঁর ওপরই কেবল তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা স্থাপন করা যাবে। যত কুরবানী শুধু তাঁর জন্যই যবেহ করা হবে এবং মানত শুধু তাঁর নামেই করা হবে। সকল প্রকার ইবাদাত শুধু তাঁর জন্যই পালন করা হবে। অতএব, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ অপরিহার্য্য হওয়ার দলীল বা প্রমাণ। এজন্যই অনেক সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাওহীদুল উলুহিয়্যাহকে যারা অস্বীকার করে তাদের ওপর সে

সব বিষয় দ্বারা দলীল পেশ করেছেন, তাওহীদুর রুবুবিয়্যার যে বিষয়ে তারা স্বীকৃতি প্রদান করত। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ٢١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءٗ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَخۡرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزۡقٗا لَّكُمۡۖ فَلَا تَجۡعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادٗا وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٢٢﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢]

“হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই রবের ইবাদাত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। তিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা করেছেন আর আকাশকে করেছেন ছাদ। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের রিযিকস্বরূপ ফলমূল উৎপাদন করেছেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে আল্লাহর জন্য কোনো সমকক্ষ স্থির করো না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২১-২২]

অতএব, আল্লাহ বান্দাদেরকে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ মেনে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর এ প্রকারের তাওহীদ হচ্ছে তাঁরই ইবাদাতের নাম। তিনি তাদের কাছে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ দিয়ে দলীল পেশ করেছেন, যে তাওহীদের মানেই হচ্ছে পূর্ববর্তী পরবর্তী সকল মানুষের সৃষ্টি, আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর সৃষ্টি, বাতাসকে অনুগত করা, বৃষ্টিবর্ষণ, উদ্ভিদ উৎপাদন এবং সে সব ফলমূল সৃষ্টি করা যা বান্দাদের রিযিক বলে বিবেচিত। সুতরাং বান্দাদের জন্য এটা সমীচিন নয় যে, তারা তাঁর সাথে অন্য এমন কারোর শরীক করবে যাদের ব্যাপারে তারা জানে যে, ওরা এ সবের কোনো কিছু

কিংবা অন্য কিছুও করে নি। অতএব, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ প্রমাণের স্বভাবজাত পন্থা হচ্ছে এ ধরনের তাওহীদের ওপর তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ দিয়ে প্রমাণ পেশ করা। কেননা মানুষ প্রথমত তার সৃষ্টির উৎস, তার কল্যাণ ও অকল্যাণের প্রতি ঔৎসুক্য দেখায়। তারপর সে ঐ সব মাধ্যমের প্রতি তার মনোযোগ স্থির করে যা তাকে সে উৎসের নিকবর্তী করে দেয় এবং যা তার মনপুত আর তার নিজের ও সে উৎসের মধ্যকার সম্পর্ককে মজবুত করে।

অতএব, তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়্যার প্রবেশদ্বার। এজন্যই আল্লাহ এ পন্থায় মুশরিকদের ওপর দলীল পেশ করেছেন এবং তাঁর রাসূলকে এ পন্থা দ্বারাই মুশরিকদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُل لِّمَنِ ٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٨٤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝٨٥ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ۝٨٦ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝٨٧ قُلۡ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيۡهِ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ۝٨٨ سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ۝٨٩﴾ [المؤمنون: ٨٤، ٨٩]

"তুমি জিজ্ঞাসা কর, এ যমীন এবং এতে যারা আছে তারা কার মালিকানাধীন যদি তোমরা জেনে থাকো? তারা বলবে, আল্লাহরই মালিকানাধীন। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা? তুমি জিজ্ঞাসা কর, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতী? তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সতর্ক হবে না? তুমি জিজ্ঞাসা কর, সকল কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে? যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার

ওপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জেনে থাকো। তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবু তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্ত হচ্ছো?" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৮৪-৮৯]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ﴾ [الانعام: ١٠٢]

"তিনি আল্লাহ তোমাদের রব। তিনি ছাড়া আর প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তাঁর ইবাদাত করো।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ১০২]

আল্লাহ রুবুবিয়্যাতের ক্ষেত্রে তাঁর একত্ববাদের দলীল দিয়ে তিনি যে ইবাদাতের হক্বদার সে বিষয়ের ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন। আর তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ প্রতিষ্ঠার জন্যই আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

"আর আমি জিন্ন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

"আমার ইবাদাতের জন্য" কথাটির অর্থ হচ্ছে তারা শুধুমাত্র আমারই ইবাদাত করবে। বান্দা শুধুমাত্র তাওহীদুর রুবুবিয়্যার ব্যাপারে স্বীকৃতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে একত্ববাদী হতে পারে না যতক্ষণ না সে তাওহীদুল উলুহিয়্যার স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং তা কার্যে পরিণত করবে। অন্যথায় মুশরিকরা তো তাওহীদুর রুবুবিয়্যার প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন

করেছিল, অথচ সে স্বীকৃতি তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করায় নি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে জিহাদ করেছিলেন। যদিও তারা এ স্বীকৃতি প্রদান করত যে, আল্লাহই স্রষ্টা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদানকারী। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۖ﴾ [الزخرف: ٨٧]

“যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৭]

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ ٩﴾ [الزخرف: ٩]

“যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আকাশমণ্ডলী ও যমীন সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই অবশ্যই বলবে, মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৯]

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ﴾ [يونس: ٣١]

“বল, কে তোমাদেরকে আকাশ ও যমীন হতে জীবিকা সরবরাহ করে অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন? জীবতকে মৃত থেকে কে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে কে বের করেন? এবং সকল

বিষয় কে নিয়ন্ত্রণ করেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১]

আল-কুরআনে এ রকম আরো বহু আয়াত রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি এ ধারণা রাখে যে, তাওহীদ হচ্ছে শুধু আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া অথবা এ স্বীকৃতি দেওয়া যে, আল্লাহই হচ্ছেন স্রষ্টা এবং জগতের কর্মবিধায়ক আর এ প্রকারের উপরেই সে তার স্বীকৃতিকে সীমাবদ্ধ রাখে, তাহলে তাওহীদের হাক্বীকাত সম্পর্কে সে জানে বলে বিবেচিত হবে না, যে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছিলেন রাসূলগণ। কেননা সে অপরিহার্য্য বিষয়টি ছেড়ে যার জন্য অপরিহার্য্য সেটির কাছে থেমে গেছে। অন্যকথায় সে দলীলের নির্দেশনা ত্যাগ করে দলীলের কাছে থেমে গেছে।

আল্লাহর উলুহিয়্যাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সকল দিক থেকেই এতে রয়েছে পরম পূর্ণতা, যাতে কোনো দিক থেকেই কোনো ধরনের ত্রুটি নেই এবং এটি সব ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হওয়াকে অপরিহার্য করে। অনুরূপভাবে সম্মান প্রদর্শন, ভয়, দো‘আ, আশা, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা, সাহায্য প্রার্থনা, পরম ভালোবাসার সাথে অবনত হওয়া ইত্যাদি সব কিছুই বিবেক, শরী‘আত ও ফিতরাতের দিক থেকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত হওয়াকে অপরিহার্য করে তোলে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য এগুলো পালন করা বিবেকের দিক থেকে, শরী‘আতের দিক থেকে এবং ফিতরাতের দিক থেকে নিষিদ্ধ বলেই বিবেচিত।

দ্বিতীয়ত: তাওহীদুল উলুহিয়্যার আলোচনা

এতে রয়েছে নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদগুলো:

প্রথম পরিচ্ছেদ: তাওহীদুল উলুহিয়্যার অর্থ ও এটি রাসূলগণের দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: শাহাদাত বাণীদ্বয়ের অর্থ এবং এতে যে সকল ভুল ও ত্রুটি হয়ে থাকে, শাহাদাত বাণীর রুকন শর্ত, দাবী ও তা ভঙ্গের কারণসমূহ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: শরী'আতে র বিধান প্রনয়ণ তথা হালাল **ও হারাম সাব্যস্ত করা আল্লাহরই অধিকার**

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: ইবাদাতের অর্থ, প্রকার ও ব্যাপকতা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ইবাদাত নির্ধারণে নানা বিভ্রান্ত ধারণা (ইবাদাতের অর্থে ত্রুটি সৃষ্টি করা কিংবা বাড়াবাড়ি করার মাধ্যমে)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: বিশুদ্ধ ইবাদাতের উপাদানসমূহ (ভালোবাসা, ভয়, বিনয় ও আশা)

প্রথম পরিচ্ছেদ:

তাওহীদুল উলুহিয়্যার অর্থ ও এটি যে রাসূলগণের দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সে প্রসঙ্গে

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ: ‘আল-উলুহিয়্যাহ’-এর অর্থ হচ্ছে ইবাদাত।

আর তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ হচ্ছে, বান্দা যেসব কাজ শরী‘আতসম্মত উপায়ে শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য করে থাকে, সেসব কাজ দ্বারা কেবল আল্লাহ তা‘আলাকেই উদ্দেশ্য করা। যেমন, দো‘আ, মান্নত, যবেহ, আশা পোষণ, ভয়, তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা, আল্লাহর প্রতি আকর্ষণ, সম্ভ্রম ও আল্লাহর কাছে ফিরে আসা ইত্যাদি। এ প্রকার তাওহীদই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত রাসূল এসেছেন সব রাসূলের দাওয়াতের মূল বিষয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]

“আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে অবশ্যই রাসূল প্রেরণ করেছিলাম দিয়ে এ নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ ٢٥﴾ [الانبياء: ٢٥]

“আর আমরা আপনার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করেছিলাম তার কাছে এ প্রত্যাদেশ করেছিলাম যে, আমি ছাড়া প্রকৃত আর কোনো ইলাহ

নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত করো।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫]

প্রত্যেক রাসূল তার জাতির প্রতি দাওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেছিলেন তাওহীদুল উলুহিয়্যার নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে। যেমন, নূহ, হূদ, সালেহ ও শু‘আইব আলাইহিস সাল্লাম বলেছিলেন,

﴿يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥٓۚ﴾ [الاعراف: ٦٤]

“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৬৪]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَإِبۡرَٰهِيمَ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُۖ﴾ [العنكبوت: ١٦]

“আর ইবরাহীমকেও, যখন তিনি তার জাতিকে বলেছিলেন, আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করো।” [সূরা আনকাবুত, আয়াত: ১৬]

তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল করেছিলেন,

﴿قُلۡ إِنِّيٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ ١١﴾ [الزمر: ١١]

“বল, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে আমি আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদাত করি।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»

“আমাকে মানুষের সাথে জিহাদ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।”[13]

শরী‘আতের হুকুম প্রযোজ্য হয় এমন সকল ব্যক্তির ওপর প্রথম যে বিষয়টি ওয়াজিব তা হচ্ছে, এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং সে সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنۢبِكَ﴾ [محمد: ١٩]

“জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাই নেই এবং তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।” [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৯]

যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করতে চায় তাকে প্রথম যে নির্দেশটি দেওয়া হয় তা হচ্ছে দু’টো শাহাদাত বাণী উচ্চারণ। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ইবাদাতে একত্ববাদই হচ্ছে রাসূলগণের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। আর তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ- এ নামকরণ এজন্যই করা হয়েছে যে, উলুহিয়্যাহ হচ্ছে আল্লাহর গুণ, যার ওপর আল্লাহর ‘আল্লাহ’ নামটি প্রমাণ বহন করছে। কেননা আল্লাহ হচ্ছে উলুহিয়্যাতের মালিক অর্থাৎ উপাসনার অধিকারী বা উপাস্য। এ প্রকার

[13] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫, ৩৯২, ১৩৯৯, ২৯৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩-১৩৮।

তাওহীদকে ‘তাওহীদুল ইবাদাহ’ও বলা হয় এ বিবেচনায় যে, দাসত্ব হচ্ছে বান্দার গুণ। কেননা একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদাত করাটা বান্দার ওপর অপরিহার্য। কারণ সে তার রবের মুখাপেক্ষী এবং রবের কাছে তার প্রয়োজন রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, “জেনে রাখো, আল্লাহর প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষীতা হলো এই যে, সে আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোনো কিছুর শরীক করবে না। তাঁর এমন কোনো সমকক্ষ নেই যে, তাঁর সাথে অন্য কিছুর তুলনা করা যেতে পারে। তবে কোনো কোনো দিক থেকে এর সাথে অন্যের কিছুটা তুলনা হতে পারে যেমন খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি শরীরের মুখাপেক্ষীতা। তবে এ দুটোর মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। কেননা বান্দার হাক্বীকাত হচ্ছে তার হৃদয় ও তার রূহ। আর তার ইলাহ আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া তার কোনোই কল্যাণ ও উপযোগিতা নেই, যে আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার আর কোনো ইলাহও নেই। সুতরাং দুনিয়ায় আল্লাহকে স্মরণ করা ছাড়া তার সেই হৃদয় ও রূহ প্রশান্ত হয় না। আর যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা বান্দার আনন্দ ও উল্লাস অর্জিত হয় তবে তা স্থায়ী হয় না, বরং তা একপ্রকার থেকে অন্য প্রকারে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির দিকে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তার যে প্রকৃত ইলাহ, তাকে অবশ্যই তার সাথে (অন্তরের সম্পর্কে) সম্পৃক্ত থাকতে হয়, সর্বাবস্থায়, সব সময় ও যেখানেই সে থাকুক না কেন।”[14]

---

[14] মাজমু আল ফাতাওয়া: ১/২৪।

এ প্রকারের তাওহীদ রাসূলগণের দাওয়াতের মূল বিষয়। কেননা এই তাওহীদই হচ্ছে সে মূল ভিত্তি যার ওপর সকল আমল স্থাপিত। এ প্রকার তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত না হলে কোনো আমলই শুদ্ধ হয় না। কেননা এই প্রকারের তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত না হলে তাওহীদবিরোধী চিন্তাভাবনা থেকে যায়, যা কিনা শির্ক বলেই বিবেচিত। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ﴾ [النساء: ٤٨،١١٦]

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না।" [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮, ১১৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۝٨٨﴾ [الانعام: ٨٨]

"যদি তারা শির্ক করে তাহলে তারা যে সকল আমল করেছিল তা তাদের থেকে নিষ্ফল হয়ে যাবে।" [সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৮৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ۝٦٥﴾ [الزمر: ٦٤]

"যদি তুমি শির্ক কর তাহলে অবশ্যই তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬৫]

এ ছাড়াও বান্দার ওপর যে সকল বিধান সর্ব প্রথম আরোপিত হয় এ প্রকার তাওহীদ তার অন্যতম। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا﴾ [النساء: ٣٦]

“আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুর শরীক করো না আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।” [সূরা আন নিসা, আয়াত: ৩৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿۞وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ﴾ [الاسراء: ٢٣]

“তোমার রব এ নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে।” [সূরা আল ইসরা, আয়াত: ২৩]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ﴾ [الانعام: ١٥١]

“বল, এসো তোমাদের রব তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন আমি তোমাদের তা পাঠ করে শোনাই। আর তা হলো এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করবে না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫১]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

শাহাদাত বাণীদ্বয়ের অর্থ এবং এতে যে সকল ভুল ও ত্রুটি হয়ে থাকে, শাহাদাত বাণীর রুকন, শর্ত, দাবী ও তা ভঙ্গের কারণসমূহ

প্রথমত: শাহাদাত বাণীদ্বয়ের অর্থ

১. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বা 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই' এ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে এ বিশ্বাস পোষণ করা ও এ স্বীকৃতি প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই ইবাদাতের উপযুক্ত নয় আর এ বিষয়টি দৃঢ়ভাবে মেনে নেওয়া এবং তদনুযায়ী আমল করা। সুতরাং 'লা-ইলাহা' এ কথাটি মূলতঃ আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে ইবাদাতের অধিকারকে অস্বীকার করার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে। আর ইবাদাত যে শুধুমাত্র আল্লাহরই অধিকার, 'ইল্লাল্লাহ' কথাটি সেটি সাব্যস্ত করছে। সংক্ষেপে এ কালেমার অর্থ হচ্ছে: 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত আর কোনো মা'বুদ নেই'।

এখানে 'লা' শব্দটির বিধেয় হিসেবে 'বিহাক্কীন' (প্রকৃত) কথাটি উহ্য রয়েছে এবং 'বেমাওজুদিন' (অস্তিত্বশীল) শব্দটিকে বিধেয় হিসেবে (উহ্য রয়েছে) উল্লেখ করা জায়েয নয়, কেননা এটা হচ্ছে বাস্তবতার বিপরীত। কারণ আল্লাহ ছাড়া অনেক উপাস্য বাস্তবে অস্তিত্বশীল রয়েছে। তাহলে অর্থ দাঁড়ায় এসব কিছুর ইবাদাত আল্লাহ তা'আলারই ইবাদাতের শামিল। অথচ এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাতিল ও অসত্য বচন। আর এটি হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদীদের অভিমত ও নীতি, যারা পৃথিবীর সবচেয়ে

বড় সত্যবিরোধী বলে বিবেচিত। এ কালেমাটির বিভিন্ন বাতিল ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে যেমন,

ক. এর অর্থ হলো 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ বা উপাস্য নেই', এটা বাতিল। কেননা এ কথাটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হক্ক ও বাতিল সকল উপাস্যই হচ্ছেন আল্লাহ, যেভাবে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে।

খ. এর অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো স্রষ্টা নেই'। মূলত: এ অর্থটি এ কালেমার মূল অর্থের অংশবিশেষ, যা কালেমার মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা এর দ্বারা শুধুমাত্র তাওহীদুর রুবুবিয়্যাই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। অথচ তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য এ অংশটুকুই যথেষ্ট নয়। আর মুশরিকগণও এ ধরনের তাওহীদকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

গ. এর অর্থ হলো 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আইনদাতা হুকুমদাতা নেই'। এটিও এ কালেমার মূল অর্থের অংশ মাত্র যা কালেমার মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয়। কারণ যদি কেউ আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসেবে মেনে নেয় এবং পাশাপাশি সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দো'আ করে অথবা অন্য কারো জন্য কোনো ইবাদাত পালন করে থাকে তাহলে সে তাওহীদবাদী বলে বিবেচিত হবে না।

অতএব, কালেমার এ তিন প্রকারের ব্যাখ্যাই বাতিল অথবা ত্রুটিপূর্ণ। সালাফ ও মুহাক্কিক আলিমদের কাছে এ কালেমার সঠিক ব্যাখ্যা হলো

এ কথা বলা যে, **“আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত সত্যিকার কোনো মা‘বুদ বা উপাস্য নেই”**।

২. **‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ -এ সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে** প্রকাশ্যে ও গোপনে এ স্বীকৃতি প্রদান যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও সকল মানুষের কাছে তাঁর প্রেরিত রাসূল। আর এ স্বীকৃতির দাবী অনুযায়ী তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন সে ব্যাপারে তাঁর আনুগত্য করা, তিনি যে সংবাদ দিয়েছেন তাতে তাকে সত্য প্রতিপন্ন করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন এবং সতর্ক করেছেন তা পরিহার করা এবং তিনি যা প্রচলন করেছেন কেবল সে পন্থায়ই আল্লাহর ইবাদাত করা।

দ্বিতীয়ত: শাহাদাত বাণীদ্বয়ের রুকনসমূহ

ক. ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর দু’টো রুকন রয়েছে। একটি হচ্ছে না বাচক, আরেকটি হচ্ছে হ্যাঁ বাচক। প্রথম রুকনটি হচ্ছে না বাচক-‘লা ইলাহা’। এ না বাচক কথাটি সকল শির্ককে বাতিল বলে ঘোষণা করেছে এবং আল্লাহ ছাড়া আর যত কিছুর ইবাদাত, আরাধনা ও উপাসনা করা হয় সে সকল কিছুর প্রতি অস্বীকৃতিকে অপরিহার্য করেছে। দ্বিতীয় রুকনটি হচ্ছে হ্যাঁ বাচক-‘ইল্লাল্লাহ’। এ রুকনটি দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো কিছুই ইবাদাতের হক্কদার ও অধিকারী নয় এবং সে অনুযায়ী আমল করাকে এ রুকন অপরিহার্য করে। এ দুটো অর্থে অনেকগুলো আয়াত আল-কুরআনে এসেছে। যেমন, আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ﴾ [البقرة: ٢٥٦]

“যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে সে সুদৃঢ় রজ্জুকে আঁকড়ে ধরল।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬] এখানে ‘যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে’ এটি প্রথম রুকন ‘লা-ইলাহা’ এর অর্থ। আর পরের ‘আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে’ কথাটি দ্বিতীয় রুকন ‘ইল্লাল্লাহ’ এর অর্থ। অনুরূপভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿إِنَّنِي بَرَآءٞ مِّمَّا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧]

“নিশ্চয় আমি মুক্ত তোমরা যার ইবাদাত করছো তার থেকে, অবশ্য সেই সত্ত্বা ছাড়া যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৭] “নিশ্চয় আমি মুক্ত” এ কথাটি প্রথম রুকনের না বোধক বক্তব্যের অর্থ এবং “অবশ্য সেই সত্ত্বা ছাড়া যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন” কথাটি দ্বিতীয় রুকনের হাঁ বোধক বক্তব্যের অর্থ।

‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল -এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার রুকন রয়েছে দু’টো। সেগুলো হলো- তিনি আল্লাহর বান্দা এবং তিনি আল্লাহর রাসূল। এ দু’টো রুকন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি অথবা ত্রুটি করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কেননা তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এ দু’টো মর্যাদাপূর্ণ গুণের মধ্য দিয়েই তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিজগতের সবচেয়ে উত্তম ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। এখানে ‘আল্লাহর বান্দা’ কথাটির

অর্থ হচেছ তিনি আল্লাহর অধিনস্থ ও আল্লাহর ইবাদাতকারী অর্থাৎ তিনি আল্লাহরই সৃষ্ট মানুষ এবং মানুষকে যা থেকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁকেও তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ক্ষেত্রে যা যা হয়ে থাকে তার ক্ষেত্রে সে একই বিষয়গুলো হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ﴾ [الكهف: ١١٠، فصلت: ٦]

"বল, নিশ্চয় আমি তো তোমাদের মতই একজন।" [সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ১১০, সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হক্ব ও দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছিলেন। আল্লাহ সে ব্যাপারে তাঁর প্রশংসাও করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ﴾

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দা (মুহাম্মাদ)এর জন্য যথেষ্ট নন?" [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৬]

﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ [الكهف: ١]

"সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন গ্রন্থ।" [সূরা আল-কাহফ, আয়াত: ১]

﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ [الاسراء: ١]

“সেই সত্ত্বার প্রশংসা ও পবিত্রতা যিনি তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাত্রিকালে মসজিদুল হারাম থেকে ভ্রমণ করিয়েছেন।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১]

আর **“রাসূল”** অর্থ হচ্ছে সে ব্যক্তি যাকে সকল মানুষের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ‘আল্লাহর বান্দা ও রাসূল’ এ দু’টো গুণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশেষিত করে শাহাদাহ বা সাক্ষ্য দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করাকে নিষেধ করা এবং তাঁর বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ আচরণ করাকেও অগ্রাহ্য করা। কেননা তাঁর উম্মতের দাবীদার এমন বহু লোকই তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে, এমনকি তাঁকে উবুদিয়াত বা বান্দার স্তর থেকে আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্যের স্তরে উপনীত করেছে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর কাছেই তারা সাহায্য প্রার্থনা করেছে। নিজেদের প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে অথবা বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যাপারে তাঁর কাছেই তারা প্রার্থনা করেছে, অথচ আল্লাহ ছাড়া তা আর কেউ দিতে পারে না। আবার কেউ কেউ তাঁর রিসালাতকে অস্বীকার করেছে অথবা তাঁকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ করার ব্যাপারে যথেষ্ট ত্রুটি দেখিয়েছে এবং তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তাঁর বিপরীত কথা ও মতামতের ওপর নির্ভর করেছে। তাঁর বিধান ও তাঁর দেওয়া সংবাদকে ভিন্নার্থে প্রয়োগের অপচেষ্টা তারা করেছে।

তৃতীয়ত: শাহাদাত বাণীদ্বয়ের শর্তসমূহ

[ক] 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্তসমূহ:

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে সাতটি শর্ত পূরণ করা অপরিহার্য্য। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্যদানকারী এ সাতটি শর্ত একসাথে পূরণ না করলে তার এ বাণী উচ্চারণ তার কোনো উপকারে আসবে না। এ সাতটি শর্ত হচ্ছে নিম্নরূপ:

[১] এ ব্যাপারে এমন জ্ঞান থাকা যা সকল অজ্ঞতাকে দূর করে।

[২] এ বাণীর প্রতি এমন দৃঢ় প্রত্যয় থাকা যা যে কোনো সন্দেহকে অপনোদন করে।

[৩] সর্বান্তকরণে এ বাণীকে মেনে নেয়া এবং কোনো ধরনের প্রত্যাখ্যান না করা।

[৪] এ বাণীর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রদর্শন এবং কোনোভাবেই আনুগত্য ত্যাগ না করা।

[৫] এমন নিষ্ঠা ও ইখলাস যা সকল প্রকার শির্ককে প্রত্যাখ্যান করে।

[৬] এ বাণীর প্রতি এমন সত্যবাদিতা পোষণ, যা এ বাণীকে যে কোনো ধরনের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

[৭] এ বাণীর প্রতি এমন ভালোবাসা ও মহব্বত যা এ বাণীর প্রতি যে কোনো ঘৃণাকে দূরীভুত করে।

এ শর্তগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ:

প্রথম শর্ত: এ বাণীর অর্থ ও উদ্দেশ্য জেনে নেওয়া এবং এ বাণী কী কী সাব্যস্ত করছে আর কোন কোন বিষয়কে অস্বীকার করছে সেটি এমনভাবে জেনে নেওয়া যাতে কোনো ধরনের অজ্ঞতা না থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٨٦﴾ [الزخرف: ٨٦]

"ঐ ব্যক্তিগণ ছাড়া, যারা জেনে-শুনে সত্যিকারভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে।" [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮৬]

'সাক্ষ্য প্রদান করা' বলতে এখানে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করা বুঝানো হয়েছে। আর 'জেনে শুনে' বলতে বুঝানো হয়েছে যে, তাদের বাকযন্ত্রের মাধ্যমে তারা যে সাক্ষ্য প্রদান করেছে অন্তর দিয়ে তারা তা জানে। অতএব, যদি কেউ এ কালেমার অর্থ না জেনে শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করে তাহলে এ কালেমা তার কোনো উপকারে আসবে না। কেননা এ কালেমা যে অর্থ বহন করছে সে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নি।

দ্বিতীয় শর্ত: প্রত্যয় ও বিশ্বাস

এ কালেমা যিনি উচ্চারণ করবেন, এ কালেমার অর্থের প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। যদি এ কালেমার অর্থের প্রতি তার কোনো ধরনের সন্দেহ থাকে তাহলে এ কালেমা তার কোনো উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ﴾ [الحجرات: ١٥]

“নিশ্চয় মুমিন হচ্ছে সে সব লোকেরাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে। তারপর তারা আর কোনো সন্দেহ করে নি।” [সূরা আল-হুজরাত, আয়াত: ১৫]

অতএব, যদি কোনো ব্যক্তি এ কালেমার প্রতি সন্দেহপরায়ণ হয়ে পড়ে সে হবে মুনাফিক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ»

“এ দেওয়ালের পেছনে যদি তোমরা এমন ব্যক্তির সাক্ষাত পাও যে হৃদয়ে দৃঢ় প্রত্যয় রেখে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত আর কোনো ইলাহ নেই তাহলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।”[15] অতএব, যার অন্তরে এ কালেমার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস সৃষ্টি হয়নি সে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার রাখে না।

তৃতীয় শর্ত: একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করা ও তিনি ছাড়া আর সকল কিছুর ইবাদাত ও আরাধনা পরিত্যাগ করার বিষয়ে এ কালেমার যে দাবী তা পরিপূর্ণভাবে সর্বান্তকরণে মেনে নেয়া। অতএব, যে ব্যক্তি এ কালেমা উচ্চারণ করবে অথচ তা মেনে নেবে না এবং এ কালেমা অনুযায়ী চলবে না, সে ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন,

---

[15] হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, হাদীস নং ১৫৬।

﴿إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۝٣٥ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ۝٣٦﴾ [الصافات: ٣٥، ٣٦]

“তাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই বললে তারা অহংকার করত এবং বলত আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহগণকে বর্জন করবো?” [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ৩৫-৩৬]

আজ কবরপূজারীদের অবস্থাও এরকমই। কেননা তারা বলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অথচ তারা কবরের ইবাদাত ও উপাসনাকে পরিত্যাগ করে না। সুতরাং তারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর যে অর্থ রয়েছে সে অর্থকে সর্বান্তকরণে গ্রহণকারী নয়।

চতুর্থ শর্ত: এ কালেমার যে অর্থ রয়েছে তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য পোষণ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰۗ﴾ [لقمان: ٢٢]

“যে কেহ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এক মজবুত হাতল।” [সূরা লুকমান, আয়াত: ২২]

এখানে ‘মজবুত হাতল’ বলতে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’কে বুঝানো হয়েছে। আর ‘আত্মসমর্পণ করে’ কথাটির অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ইখলাস রেখে ও নিষ্ঠাবান হয়ে আল্লাহর আনুগত্য করে।

পঞ্চম শর্ত: সত্যবাদিতা

এ বাণী যখন কেউ উচ্চারণ করবে, তখন হৃদয় দিয়ে সে এ বাণীকে সত্য প্রতিপন্ন করবে। যদি সে শুধু তার মুখে এ বাণী উচ্চারণ করে অথচ তার হৃদয় এ বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করল না তাহলে সে হবে মিথ্যাবাদী মুনাফিক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخۡدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ ٩ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضٗاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١٠﴾ [البقرة: ٨، ١٠]

“আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছি, কিন্তু তারা মুমিন নয়। আল্লাহ এবং মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজদের ভিন্ন অন্য কাউকে প্রতারিত করে না তা তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি; কারণ তারা মিথ্যাবাদী।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ৮-১০]

ষষ্ঠ শর্ত: ইখলাস বা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা রাখা

এর অর্থ হচ্ছে সকল প্রকার শির্কের উপাদান হতে আমলকে বিশুদ্ধ রাখা। যেমন, এ কালেমার সাক্ষ্য দিয়ে পৃথিবীর কোনো লোভ না করা অথবা লোক দেখানোর জন্যও তা উচ্চারণ না করা কিংবা এ কালেমা উচ্চারণ করে প্রসিদ্ধি অর্জনের ইচ্ছা পোষণ না করা; কেননা উতবান থেকে বর্ণিত একটি সহীহ হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ»

“নিশ্চয় আল্লাহ জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন সে ব্যক্তিকে, যে বলে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত আর কোনো ইলাহ নেই এমনভাবে যে, সে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছাই পোষণ করে।”[16]

সপ্তম শর্ত: এ কালেমার প্রতি, তার অর্থের প্রতি এবং এ কালেমা অনুযায়ী যারা আমল করেন সে সব লোকদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِۗ﴾ [البقرة: ١٦٥]

“মানুষের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন অনেক সমকক্ষ স্থির করে যাদেরকে তারা আল্লাহকে ভালোবাসার

[16] হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২৫, ১১৮৬, ৫৪০১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫২৮।

মতই ভালোবেসে থাকে। অথচ যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকেই সর্বাধিক ভালোবাসে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৫]

সুতরাং ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর যারা অনুসারী বা প্রবক্তা তারা একনিষ্ঠ ও খালিসভাবে আল্লাহকে মহব্বত করে থাকে। পক্ষান্তরে যারা মুশরিক ও শির্কীতে লিপ্ত তারা আল্লাহকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর সাথে গায়রুল্লাহকেও ভালোবাসে। আর এ বিষয়টি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর যে দাবী রয়েছে তার সাথে সংঘাতপূর্ণ।

[খ] ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল’ এ সাক্ষ্য দেওয়ার শর্তগুলো হলো নিম্নরূপ:

[১] মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান ও গোপনে হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ।

[২] এ শাহাদাত বাণী উচ্চারণ করা ও প্রকাশ্যে মুখে তার স্বীকৃতি দেওয়া।

[৩]] মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ। তিনি যে সত্য নিয়ে এসেছেন সে সত্য অনুযায়ী আমল করা এবং তিনি যে বাতিল থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তা পরিত্যাগ করা।

[৪] তিনি অতীত ও ভবিষ্যতের যে গায়েবের ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য প্রতিপন্ন করা।

[৫] নিজের প্রাণ, সম্পদ, সন্তান, জনক ও সকল মানুষের মহববতের চেয়েও তাঁর প্রতি বেশি মহব্বত ও ভালোবাসা পোষণ করা।

[৬] তাঁর কথাকে সব ব্যক্তির কথার ওপর প্রাধান্য দেওয়া ও তাঁর সুন্নত অনুযায়ী আমল করা।

চতুর্থত: শাহাদাত বাণীদ্বয়ের চাহিদা বা দাবী

[ক] 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এ শাহাদাত বাণীর দাবী হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর যত উপাস্য রয়েছে সকল উপাস্যের ইবাদাত, আরাধনা ও পূজা পরিত্যাগ করা। যা 'লা-ইলাহা' এ না বোধক কথাটি দ্বারা বুঝা যায়। আর আল্লাহর সাথে কোনো কিছুর শরীক না করে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা যা 'ইল্লাল্লাহ' এ হ্যাঁ বাচক কথাটি দ্বারা বুঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় শাহাদাত বাণী উচ্চারণ করে থাকে এমন বহু লোকই এ শাহাদাত বাণীর দাবীর বিরোধিতা করে থাকে এবং এ ইলাহিয়্যা বা উপাস্য হওয়ার ব্যাপারটিকে তারা সৃষ্টিজগতের কারো কারো জন্য, কবরের জন্য, মাজারের জন্য, তাগুতের জন্য, গাছপালা ও পাথরের জন্য সাব্যস্ত করে থাকে। এদের ধারণা হলো যে তাওহীদ একটি বিদ'আত এবং তারা ঐসব লোকদের বিরোধিতা করে থাকে যারা তাদেরকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান জানায়। আর তারা সেসব লোকদের ত্রুটিও বর্ণনা করে থাকে যারা ইবাদাতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে।

[খ] 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' এ শাহাদাত বাণীর দাবী ও চাহিদা হচ্ছে তাঁর আনুগত্য করা, তাকে সত্য প্রতিপন্ন করা, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করা এবং তাঁর সুন্নত অনুযায়ী আমলের মধ্যেই সকলে সীমাবদ্ধ থাকা। এছাড়া এর বাইরে যে বিদ'আত ও অন্যান্য নতুন

প্রথাসমূহের প্রচলন রয়েছে তা পরিত্যাগ করা এবং তাঁর কথাকে অন্য সব লোকের কথার ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

পঞ্চমত: এ শাহাদাত বাণীদ্বয়কে বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

এ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ মূলত ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয় হিসেবেই পরিচিত। কেননা শাহাদাত বাণীদ্বয় এখানে হচ্ছে সে দু'টো বাণী যা উচ্চারণ করে কোনো ব্যক্তি ইসলামে অনুপ্রবেশ করে। এ বাণীদ্বয় উচ্চারণ করার মানে হচ্ছে সেগুলোর অর্থকে মেনে নেওয়া, সেগুলোর দাবী ও চাহিদা অনুযায়ী সব সময় কাজ করতে অভ্যস্ত হওয়া এবং এ বাণীদ্বয়ের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামের বড় বড় ইবাদাতগুলো পালনে অভ্যস্ত হওয়া। যদি এ মূলনীতি পালনে কারো ত্রুটি দেখা যায় তাহলে শাহাদাত বাণী উচ্চারণের সময়ে যে প্রতিজ্ঞা সে করেছিল তা ভঙ্গ করে বসল।

ইসলাম ভঙ্গকারী অনেকগুলো বিষয় রয়েছে। ফকীহ বা ইসলামী আইনবীদগণ ফিকহের গ্রন্থসমূহে এর জন্য একটি বিশেষ অধ্যায় রচনা করেছেন যার নাম তারা দিয়েছেন 'বাব আর-রিদ্দা' বা রিদ্দাত অধ্যায়। সেসব ভঙ্গকারী বিষয়গুলো মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো দশটি বিষয় যা শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব রহ. বর্ণনা করেছেন।

[১] আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে শির্ক করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النساء: ٤٨]

“নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এছাড়া যাকে ইচ্ছা তিনি যে কোনো পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮, ১১৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ٧٢﴾ [المائدة: ٧٢]

“নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন। তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৭২]

এর মধ্যে আরো রয়েছে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা যেমন মাযারের উদ্দেশ্যে যবেহ করা কিংবা জ্বীনের উদ্দেশ্যে যবেহ করা।

[২] যে ব্যক্তি তার নিজের ও আল্লাহর মাঝখানে মাধ্যম স্থির করে, এরপর সে ঐ মাধ্যমসমূহকে আহ্বান করে, তাদের কাছে দো‘আ করে শাফা‘আত প্রার্থনা করে এবং তাদের ওপর সে তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা স্থাপন করে। সকল মুসলিম আলিমদের সম্মতিক্রমে সে কাফির হয়ে যাবে।

[৩] যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির বলে না এবং তারা কাফির হবে কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদকে বিশুদ্ধ মনে করে সে কাফির হয়ে যাবে।

[৪] যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো আদর্শ আরো বেশি পরিপূর্ণ অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম ও বিধানের চেয়ে অন্য কারো হুকুম ও বিধান উত্তম, যেমন ঐসব লোক যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানের ওপর তাগুতের বিধানকে প্রাধান্য দেয় এবং ইসলামের হুকুমের ওপর অন্যবিধ হুকুমকে প্রাধান্য দেয় তারা কুফুরীর মধ্যে লিপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তার কোনো কিছুর প্রতি যে ব্যক্তি ঘৃণা পোষণ করে, নিজে সে আমল করা সত্ত্বেও সে কাফির হয়ে যাবে।

[৬] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীন বা এ দীনের কোনো সাওয়াব বা শাস্তির কোনো কিছুর প্রতি যে ব্যক্তি উপহাস করবে সেও কুফুরী করল। এর ওপর দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার বাণী,

﴿قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ ٦٥ لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦]

“তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি উপহাস করছ? তোমরা কোনো ওজর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানে পরে কুফুরী করেছ।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৬৫-৬৬]

[৭] জাদু: এর মধ্যে রয়েছে কাউকে কোনো কিছু থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য কিংবা কাউকে কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য জাদু করা। সম্ভবত: এ কথা দুটো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর

প্রতি ভালোবাসা পোষণ থেকে ফিরিয়ে রাখার জন্য যে জাদু করা হয় অথবা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মহব্বত বাড়ানোর জন্য যে জাদু করা হয়। যে ব্যক্তি তা করবে অথবা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে সে কুফুরী করল। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنۡ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَةٞ فَلَا تَكۡفُرۡۖ﴾ [البقرة: ١٠٢]

"আর এ দুই মালাঈকা কাউকে জাদু শিক্ষা দিত না এ কথা না বলা পর্যন্ত যে, নিশ্চয় আমরা ফিতনা। সুতরাং তোমরা কুফুরী করো না।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১০২]

[৮] মুশরিকদের পক্ষপাতিত্ব করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١﴾ [المائدة: ٥١]

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা তাদেরই অন্তর্গত বলে বিবেচিত হবে। নিশ্চয় আল্লাহ এমন সত্ত্বাকে হিদায়াত দান করেন না যারা যালিম।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫১]

[৯] যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, কিছু কিছু লোকের পক্ষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত থেকে বের হয়ে যাওয়ার অনমুতি রয়েছে বা বের হওয়া সম্ভব যেমন মূসা আলাইহিস সাল্লামের শরী'আত থেকে খিদির বের হয়ে গিয়েছিলেন। যার এ বিশ্বাস হবে সে কাফির বলেই বিবেচিত হবে। একদল গোঁড়া ভন্ড সুফী যেমন

বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা এমন এক স্তরে পৌঁছে যায় যে স্তরে পৌঁছে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের আর কোনো প্রয়োজন থাকে না।

[১০] আল্লাহর দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। ফলে তাঁর দীনের শিক্ষা গ্রহণ না করা এবং সে শিক্ষা অনুযায়ী আমল না করা। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعۡرِضُونَ ٣﴾ [الاحقاف: ٣]

"যারা কুফুরী করেছে তারা যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল সে বিষয় থেকে বিমুখ।" [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৩]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِۦ ثُمَّ أَعۡرَضَ عَنۡهَآۚ إِنَّا مِنَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ٢٢﴾ [السجدة: ٢٢]

"ঐ ব্যক্তির চাইতে যালিম কে আছে যাকে আল্লাহর আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তা থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমি অপরাধীদের থেকে তার প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করবো।" [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২২]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাব বলেন, 'তাওহীদ বিনষ্টকারী এ সব বিষয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, চাই বিনষ্টকারী ব্যক্তি সে হাস্যোচ্ছলেই করুক বা গুরুত্বের সাথেই বলুক কিংবা ভয়ে বলুক। অবশ্য যদি তাকে বাধ্য করা হয় তার ব্যাপারটি ভিন্ন। ইসলাম

বিনষ্টকারী এ সকল বিষয়ই বিপদের দিক থেকে অত্যন্ত ভয়াবহ এবং মানুষের মধ্যে খুব বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই মুসলিমের উচিত হবে এগুলো সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং নিজের ব্যাপারে এ বিষয়গুলোকে ভয় করে চলা। আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর ক্রোধের অগ্নি থেকে এবং তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে পানাহ চাই'।[17]

[17] মাজমু'আত-তাওহীদ আন-নাজদিয়াহ পৃ. ৩৭-৩৯।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ:

শরী‘আতের বিধান প্রণয়ন

শরী‘আত প্রণয়ন মহান আল্লাহ তা‘আলারই অধিকার। শরী‘আত প্রনয়ণের অর্থ হচ্ছে সে সকল রীতি-নীতি প্রণয়ন যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য নাযিল করেছেন। এ হচ্ছে সে রীতি-নীতি বান্দাগণ যা তাদের আকীদাহ, মু‘আমালাত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মেনে চলবে। এর মধ্যে রয়েছে হালাল হারামের বিধান। সুতরাং আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছুকে হালাল করার অধিকার কারো নেই এবং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছুকে হারাম করার অধিকারও কারো নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٞ وَهَٰذَا حَرَامٞ لِّتَفۡتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۚ﴾ [النحل: ١١٦]

“যেহেতু তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে, তাই আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না এটা হালাল এবং ওটা হারাম।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ ۝٥٩﴾ [يونس: ٥٩]

“বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তোমরা তার কিছু হালাল ও হারাম করেছ? বল, আল্লাহ কি

তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন? নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছ?” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৯]

আল্লাহ কুরআন এবং সুন্নাহর কোনো দলীল ছাড়া হালাল ও হারাম সাব্যস্ত করাকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটা হচ্ছে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করার শামিল। তিনি আরো বলেছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো দলীল ছাড়া কোনো কিছুকে ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত করে অথবা হারাম বলে সাব্যস্ত করে, সে নিজেকে এমন ক্ষেত্রে আল্লাহর একজন শরীক বলে স্থির করল যেটি আল্লাহ তা‘আলারই বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর সেটি হচ্ছে শরী‘আত প্রণয়ন। **আল্লাহ তা**‘আলা বলেন,

﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: ٢١] “নাকি তাদের এমন শরীকগণ রয়েছে যারা তাদের জন্য দীনের এমন কিছু বিষয় শরী‘আত সিদ্ধ করেছে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি।” [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ২১]

যে ব্যক্তি জেনে শুনে আল্লাহর পরিবর্তে শরী‘আত প্রণয়নকারী এ ব্যক্তির আনুগত্য করবে এবং তার কার্যবলীর সাথে একমত পোষণ করবে সে মূলতঃ তাকে আল্লাহর সাথে শরীক করল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١﴾ [الانعام: ١٢١]

“যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তাহলে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক হবে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২১]

অর্থাৎ আল্লাহ যেসব মৃতকে হারাম করেছেন যারা সেগুলোকে হালাল করে, তাদেরকে যারা এতে অনুসরণ করবে তারা হবে মুশরিক। যেমন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন, যারা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল করার ক্ষেত্রে এবং আল্লাহ হালালকৃত বস্তুকে হারাম করার ক্ষেত্রে পাদ্রী ও ধর্মজাযকদের অনুসরণ করবে তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾ [التوبة: ٣١]

"তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসারবিরাগীগণকে তাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে আর মরিয়ম তনয় মসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি কতই না পবিত্র!" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১]

'আদি ইবন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন এ আয়াতটি শুনলেন তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাতো তাদের ইবাদাত করি না। তখন তাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারা কি তা হালাল করে না, আর তোমরাও তা হালাল বলে মেনে নাও? আল্লাহ যা হালাল করেছেন তারা কি তা হারাম করে না, আর তোমরাও তা হারাম বলে মেনে নাও?" তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

“এটিই হচ্ছে তাদের ইবাদাত করার অর্থ।”[18] শাইখ আব্দুর রহমান ইবন হাসান রহ. বলেন, হাদীসটিতে এ প্রমাণ রয়েছে যে, পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী ধর্মযাজকদের আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে অনুসরণ এর মানে হচ্ছে আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ইবাদাত করা এবং তা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে যা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কেননা আল্লাহ আয়াতের শেষে বলেছেন,

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١﴾ [التوبة: ٣١]

“অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তারা যাকে শরীক করে তা হতে তিনি কত পবিত্র ও মহান!” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৩১]

এ আয়াতের অনুরূপ আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقٞۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِهِمۡ لِيُجَٰدِلُوكُمۡۖ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمۡ لَمُشۡرِكُونَ ١٢١﴾ [الانعام: ١٢١]

“যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় নি তার কিছুই তোমরা আহার করো না তা অবশ্যই পাপ। নিশ্চয় শয়তানেরা তাদের বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথা মত চল তবে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হবে।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১২১]

---

[18] হাদীসটি সুনান তিরমীযিতে বর্ণিত হয়েছে।

বহু লোক এতে নিপতিত হয়েছে। আর এসব লোকদেরকে অন্যরা অন্ধ অনুকরণ করেছে। কেননা তারা অনুসৃত ব্যক্তির যখন বিরোধীতা করে তখন কোনো দলীল প্রমাণকে বিবেচনায় আনেনি। আর এটি হচ্ছে শির্কের অন্তর্গত।

অতএব, আল্লাহর শরী'আতকে সঠিকভাবে মেনে চলা এবং এ শরী'আতের বিপরীত আর সবকিছু পরিত্যাগ করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর দাবী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ:

ইবাদাতের অর্থ ও ব্যাপকতা

[১] ইবাদাতের অর্থ

ইবাদাতের মূল অর্থ হচ্ছে নম্র হওয়া ও বিনয়ী হওয়া। আর শরী‘আতের পরিভাষায় ইবাদাতের অনেকগুলো সংজ্ঞা রয়েছে। তবে তার অর্থ একটিই। এর মধ্যে একটি সংজ্ঞা হলো - ইবাদাত হচ্ছে রাসূলগণের ভাষায় আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করা। আরেকটি সংজ্ঞা হলো- ইবাদাত হচ্ছে আল্লাহর জন্য বিনয়ী ও নম্র হওয়া। সুতরাং ইবাদাতের মানে হচ্ছে পরিপূর্ণ ভালোবাসার সাথে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করা। আর ইবাদাতের একটি ভালো সংজ্ঞা হলো- ‘ইবাদাত হচ্ছে সে সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা ও কাজের নাম, যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন’।

ইবাদাত কয়েকভাগে বিভক্ত:

১. অন্তরের ইবাদাত

২. জিহ্বা বা বাকযন্ত্রের ইবাদাত

৩. শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইবাদাত।

ভয়, আশা, ভালোবাসা, তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা, নিয়ামতের প্রতি আকর্ষণ, আযাবের প্রতি ভয় পোষণ এসবই হচ্ছে অন্তরের ইবাদাত। আর জিহবা ও অন্তর দিয়ে তাসবীহ-তাহলীল পাঠ, আল্লাহর প্রশংসা ও

শোকর আদায় হচ্ছে যুগপৎভাবে জিহবা ও অন্তরের ইবাদাত। এছাড়া সালাত, যাকাত, হজ ও জিহাদ -এগুলো হচ্ছে অন্তর ও শরীরের ইবাদাত। ইবাদাত আরো বহু প্রকারের রয়েছে যা অন্তর দিয়ে, জিহবা দিয়ে এবং শরীরের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে পালন করা যায়। ইবাদাতের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন,

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٨﴾ [الذاريات: ٥٦، ٥٨]

“আমি জিন্ন ও ইনসানকে আমার ইবাদাতের জন্যই শুধু সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের কাছে কোনো রিযিক চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার করাক। নিশ্চয় আল্লাহই রিযিকদাতা, পরাক্রমশালী শক্তির আধার।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬-৫৮]

আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, জিন্ন ও ইনসানকে সৃষ্টির হিকমত হচ্ছে তারা আল্লাহর ইবাদাত করবে, যদিও আল্লাহ তাদের ইবাদাত থেকে অমুখাপেক্ষী। বরং তারাই আল্লাহর ইবাদাতের মুখাপেক্ষী। কেননা তারা আল্লাহর মুখাপেক্ষী। সুতরাং তারা আল্লাহর শরী‘আত অনুযায়ী তাঁর ইবাদাত করবে।

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করতে অস্বীকার করবে সে হবে অহংকারী এবং যে ব্যক্তি তাঁর ইবাদাত করবে ও তাঁর সাথে অন্য আরেক সত্ত্বার ইবাদাত করবে সে হবে মুশরিক। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করবে এমন পদ্ধতিতে যার অনুমতি তিনি দেন নি

সে হবে বিদ‘আতী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রনয়ণ করা শরী‘আতের পদ্ধতিতে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে সে হবে তাওহীদবাদী মুমিন।

[২] ইবাদাতের প্রকারভেদ ও তার ব্যাপকতা:

ইবাদাতের বহু প্রকারভেদ রয়েছে। জিহবা ও শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আল্লাহর প্রকাশ্য আনুগত্যের যত কাজ রয়েছে এবং অন্তরের মাধ্যমে যত সাওয়াবের কাজ করা হয় ইবাদাত এ রকম সকল কাজকেই শামিল করে। যেমন তাসবীহ, তাহলীল, কুরআন তেলাওয়াত, সালাত, যাকাত, সিয়াম ,হজ, জিহাদ, সৎকাজের নির্দেশ প্রদান, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করা, আত্মীয়-স্বজন-এতিম-মিসকীন ও মুসাফিরদের প্রতি ইনসাফ করা, অনুরূপভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করা, আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা ও ইখলাস রাখা, আল্লাহর বিধানের প্রতি সবর করা, তাকদীর ও আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা, আল্লাহর রহমতের আশা করা, আল্লাহর আযাবকে ভয় করা। অতএব, ইবাদাত প্রকৃতপক্ষে মু’মিন বান্দার প্রত্যেক কাজকেই শামিল করে যখন ঐ কাজগুলো দ্বারা সে আল্লাহর নৈকট্যের নিয়ত করে অথবা যা নৈকট্য অর্জনে সহায়ক। এমনকি স্বভাব বা প্রথাগত কাজগুলো যেমন নিদ্রা, পানাহার, বেচাকেনা, জীবিকার সন্ধান, বিবাহ ইত্যাদি দ্বারাও যখন বান্দা ইবাদাত পালনের শক্তি অর্জনের লক্ষ্য স্থির করে তখন তার বিশুদ্ধ ও সৎ নিয়তের কারণে এগুলো ইবাদাতে

পরিণত হবে, যার দ্বারা বান্দা সাওয়াব অর্জন করবে। ইবাদাত শুধু দীনের পরিচিত বড় বড় আমল করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ:

ইবাদাত নির্ধারণে নানা বিভ্রান্ত ধারণা

ইবাদাত হচ্ছে ওহী নির্ভর। এ কথার অর্থ হলো: আল-কুরআন ও সুন্নাহ'র দলীল ছাড়া ইবাদাতের কোনো কিছুই শরী'আতসিদ্ধ নয়। আর যা শরী'আতসিদ্ধ নয় তা বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যাত বলেই গণ্য হয়। যেমন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে যার ওপর আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"[19] অর্থাৎ তার সেই আমলটি তার উপরেই ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হয় না বরং এ আমল করে সে গুনাহগার হয়। কেননা এ আমলটি তখন পাপ ও নাফরমানি হিসেবে সাব্যস্ত হয় এবং তা আনুগত্য ও ইবাদাত বলে বিবেচিত হয় না। সুতরাং শরী'আত সম্মত ইবাদাত পালনের বিশুদ্ধ পদ্ধতি হচ্ছে - অলসতা ও উপেক্ষা এবং বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামি করার মাঝামাঝি একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন,

﴿فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطۡغَوۡاْۚ﴾ [هود: ١١٢]

---

[19] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৩৪৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫৯০, ৭৬৬৬।

“সুতরাং তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ তাতে স্থির থাকো এবং তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তারাও স্থির থাকুক। আর তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১১২]

এ আয়াতে ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে একটি বিশুদ্ধ পন্থার দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আর সেটি হচ্ছে ন্যায় পথে ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে স্থির থাকা। যার মধ্যে কোনো বাড়াবাড়িও নেই, কোনো কমতিও নেই। সীমালঙ্ঘন হচ্ছে বাড়াবাড়ি ও গোঁড়ামির মাধ্যমে সীমা অতিক্রম করা। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে, তাঁর তিনজন সাহাবী নিজেদের আমলের মধ্যে কমতি আছে বলে মনে করল, যেমন তাদের একজন বললেন, আমি রোযা রেখে যাব এবং রোযা ভাংবো না। আরেকজন বললেন, আমি সালাত পড়ব এবং কোনো শয়ন করবো না। তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, আমি নারীদেরকে বিবাহ করবো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আর আমি সাওমও রাখব এবং সাওম ভাঙ্গবো, মেয়েদেরকে বিবাহ করব। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।”[20]

এখন দু’ ধরনের লোক দেখতে পাওয়া যায় যারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে দুটো পরস্পর বিরোধী মতের ওপর রয়েছে।

প্রথম দল: তারা ইবাদাতের অর্থ নির্ণয়ে ত্রুটি সৃষ্টি করেছে এবং ইবাদাত আদায়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ অবহেলা ও গাফলতি প্রদর্শন করেছে। এমনকি তারা বহু ইবাদাতকে অকার্যকর করে দিয়েছে আর ইবাদাতকে তারা

---

[20] হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

কয়েকটি নির্দিষ্ট আমলের ওপর এবং বিশেষ বিশেষ অল্প কিছু নিদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছে, যা শুধুমাত্র মসজিদে আদায় করা হয়। আর ঘরে, অফিসে, ব্যবসায় কেন্দ্রে, রাস্তায়, মু'আমালাতের ক্ষেত্রে, রাজনীতিতে, বিবাদ-বিসম্বাদে, ফায়সালার ক্ষেত্রে ও জীবনের আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে ইবাদাত করার কোনো সুযোগই তাদের কাছে নেই। এটি সত্যি যে, মসজিদের বিরাট ফযিলত ও মর্যাদা রয়েছে এবং পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে আদায় করাটা ওয়াজিব। কিন্তু ইবাদাত মসজিদের ভিতরে ও মসজিদের বাইরে মুসলিম জীবনের পুরোটাকেই শামিল করে।

দ্বিতীয় দল: ইবাদাতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। তারা মুস্তাহাব পর্যায়ের ইবাদাতগুলোকে ওয়াজিবের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তারা অনেক মুবাহকে হারাম করে দিয়েছে এবং যারা তাদের নিয়ম নীতির খেলাফ করে তাদেরকে তারা বিভ্রান্ত ও ভুল পথে আছে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। এভাবে ইবাদাতের পুরো অর্থকে তারা ভ্রান্তভাবে পাল্টে দিয়েছে। অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শই হচ্ছে সর্বোত্তম আদর্শ এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে নতুন অবিষ্কৃত সব কিছুই হচ্ছে সবচেয়ে মন্দ ও নিকৃষ্ট।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ:

বিশুদ্ধ ইবাদাতের উপাদানসমূহ

ইবাদাত তিনটি উপাদানের সমষ্টি। সেটি হচ্ছে:

১. মহব্বত বা ভালোবাসা

২. খাউফ বা ভয়

৩. রাজা বা আশা

মহব্বত থাকবে বিনয়ের সাথে, আর ভয় ও আশা থাকবে পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত -ইবাদাতের মধ্যে এ অনুভূতি সম্মিলিতভাবে থাকাটা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের গুণ বর্ণনায় বলেছেন, ﴿يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾ "তিনি তাদেরকে ভালোবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৫৪]

তিনি আরো বলেন, ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبّٗا لِّلَّهِۗ﴾ "যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৬৫]

তিনি রাসূল ও নবীগণের গুণ বর্ণনায় বলেন,

﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ ٩٠﴾ [الانبياء: ٩٠]

“তারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করত, তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।” [সূরা আল-অম্বিয়া, আয়াত: ৯০]

সালাফ তথা পূর্ববর্তী আলিমদের কেউ কেউ বলেন, যে ব্যক্তি শুধু মহব্বতের সাথে আল্লাহর ইবাদাত করবে সে ‘যিন্দিক’। আর যে ব্যক্তি শুধু আশা নিয়ে ইবাদাত করবে সে ‘মুরজিয়া’। আর যে ব্যক্তি শুধু ভয়-ভীতির সাথে তাঁর ইবাদাত করবে সে হবে ‘হারুরী’।[21]

আর যে ব্যক্তি মহব্বত, ভীতি ও আশা এ তিনের সম্মিলনে তাঁর ইবাদাত করবে সে হবে মু’মিন ও তাওহীদপন্থী। শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা তার ‘আল-উবূদিয়াহ’ গ্রন্থে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেন, “আল্লাহর দীন মানে হচ্ছে তাঁর ইবাদাত, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর জন্য বিনয়ী হওয়া। ইবাদাতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে বিনয় ও নম্রতা। বলা হয়, ‘নম্র রাস্তা’ যখন তা মানুষের পদভারে নরম হয়ে যায়। কিন্তু ইবাদাত পালনের নির্দেশ নম্রতার অর্থ যেমন অন্তর্ভুক্ত করে তেমনি মহববতের অর্থকেও শামিল করে। সুতরাং ইবাদাত আল্লাহ তা‘আলার জন্য পরিপূর্ণ ভালোবাসার সাথে পরিপূর্ণ নম্রতা ও বিনয়কে শামিল করে। যে ব্যক্তি কোনো মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণের পাশাপাশি তার জন্য নম্র হয় সে তার ইবাদাতকারী বলে গণ্য হবে না। আর যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে

---

[21] ‘যিন্দিক’ হলো সে ব্যক্তি যে দ্বীন ও শরীয়াত মানে না। ‘মুরজিয়া’ হল ঐ ব্যক্তি যে মুখে ও মনে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু কার্যে পরিণত করে না। আর হারুরী হল খারিজীদের অন্তর্ভুক্ত।

ভালোবাসে অথচ তার জন্য বিনম্র হয় না সেও তাঁর ইবাদাতকারী বলে গণ্য হবে না। যেমন, কোনো ব্যক্তি তার বন্ধু ও সন্তানকে ভালোবাসে। এজন্যই এদুটোর কোনো একটি এককভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বরং আল্লাহ বান্দার কাছে সবকিছু থেকে যেমন প্রিয়তম হতে হবে তেমনি আল্লাহ বান্দার কাছে সবকিছু থেকে সম্মানিত হতে হবে, বরং পরিপূর্ণ মহব্বত এবং পরিপূর্ণ বিনয়ের অধিকারী আল্লাহ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না.....।"[22]

এগুলো হচ্ছে ইবাদাতের উপাদান, যাকে ঘিরে ইবাদাত আবর্তিত হয়। আল্লামাহ ইবনুল কাইয়্যিম তার 'আন-নূনিয়্যিাহ' কাব্যগ্রন্থে বলেন,

"রহমানের ইবাদাত হচ্ছে তাঁকে পূর্ণরূপে ভালোবাসা

ইবাদাতকারীর বিনয় ও নম্রতার পাশাপাশি, এ হলো দু'মেরু।

এ দু'টো মেরুর উপরই আবর্তিত হতে থাকে ইবাদাতের দিগন্ত,

দু'মেরু যতদিন থাকবে ততদিন এভাবেই আবর্তিত হবে এ দিগন্ত।

রাসূল্লাহর নির্দেশই হলো সে আবর্তনের কেন্দ্রস্থল

প্রবৃত্তি, নাফস ও শয়তানের অনুকরণ দ্বারা তা আবর্তিত হয় না।"

এখানে ইবন ইবনুল কাইয়্যিম রহ. প্রিয়তম সত্ত্বা তথা আল্লাহর উদ্দেশ্যে মহব্বত ও ভালোবাসা এবং বিনয় ও নম্রতার ওপর ইবাদাতের পরিক্রমণকে দুই মেরুর ওপর আকাশের পরিক্রমণের সাথে তুলনা

[22] মাজমু আত-তাওহীদ আন নাজদিয়া পৃ. ৫৪৯।

করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, ইবাদাতের পরিক্রমণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও তিনি যা প্রণয়ন করেছেন তার সাথে পরিক্রমণ করে, প্রবৃত্তির সাথে নয় এবং এ বিষয়ের সাথে নয় যা মানুষের নাফস ও শয়তান নির্দেশ প্রদান করে থাকে; কেননা তা ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা প্রনয়ণ করেছেন তা-ই ইবাদতের দিগন্তকে পরিচালনা করে থাকে। আর বিদ‘আত, কুসংস্কার, প্রবৃত্তি এবং পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ইবাদাতের দিগন্তকে পরিচালনা করে না।

তৃতীয়ত: তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত

এতে রয়েছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো:

প্রথমত: আল্লাহর নামসমূহ ও সিফাত নির্ধারণে কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেকের দলীল

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর নাম ও সিফাতের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসৃত নীতি

তৃতীয়ত: যারা আল্লাহর নাম ও সিফাতকে অস্বীকার করে অথবা এর কিয়দংশ অস্বীকার করে তাদের জবাব

প্রথমত: আল্লাহর নামসমূহ ও সিফাত নির্ধারণে কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেকের দলীল

[ক] কুরআন ও সুন্নাহর দলীল

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, তাওহীদ তিনভাগে বিভক্ত: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত। আমরা প্রথম দু'টির ওপর বেশ কিছু প্রমাণ উল্লেখ করেছি। এখন আমরা তৃতীয় প্রকার তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাতের ওপর কিছু দলীল পেশ করব।

১. আল-কুরআনের দলীলের মধ্যে রয়েছে:

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝١٨٠﴾ [الاعراف: 180]

“আর আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম তোমরা সে নামে তাঁকে আহ্বান করো। আর সেসব লোকদের তোমরা পরিত্যাগ করো যারা তাঁর নামসমূহে বিকৃতি সাধন করে। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৮০]

এ আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিজের জন্য অনেকগুলো নাম সাব্যস্ত করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, সেগুলো সুন্দরতম। তিনি তাঁকে সে নামসমূহে ডাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন এভাবে তাঁকে ডাকা হবে যে, ‘ইয়া আল্লাহ ! ইয়া রাহমান! ইয়া রাহীম! ইয়া হাইয়্যু! ইয়া কাইয়্যেম! ইয়া রাব্বাল আলামীন!’ আর যারা

তাঁর নামে বিকৃতি সাধন করে তাদেরকে তিনি ভয় প্রদর্শন করেছেন। অর্থাৎ যারা তাঁর নামের ব্যাপারে সত্যকে পাশ কাটিয়ে চলে, আল্লাহ থেকে সে নামগুলোকে অস্বীকার করার মাধ্যমে অথবা তার যে শুদ্ধ অর্থ রয়েছে সে শুদ্ধ অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থে সেগুলোকে প্রয়োগ করার মাধ্যমে কিংবা অন্য আরো যেভাবে তা বিকৃত করা যায় সেভাবে বিকৃত করার মাধ্যমে; তাদেরকে তিনি এ মর্মে ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, তাদের এ মন্দ কর্মের প্রতিফল তিনি অচিরেই তাদেরকে প্রদান করবেন। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ ٨﴾ [طه: ٨]

“আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম।” [সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৮]

তিনি আরো বলেছেন,

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢٤﴾ [الحشر: ٢٢، ٢٤]

“তিনি আল্লাহ। তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি গায়েব ও দৃশ্যমান সবকিছুর ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনি আল্লাহ। তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি মালিক, তিনি পবিত্র, তিনি শান্তি, তিনি নিরাপত্তাবিধায়ক, তিনি পরাক্রমশালী,

তিনি প্রবল, তিনি অতি মহিমান্বিত, তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র ও মহান। তিনি আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, অবয়বদানকারী। তাঁর রয়েছে সকল উত্তম নাম। আকশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলি তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২২-২৪]

এ আয়াতগুলো আল্লাহর নামসমূহকে সাব্যস্ত করে।

[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নায় আল্লাহর নামসমূহ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে অনেকগুলো দলীল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"আল্লাহর রয়েছে নিরানব্বইটি নাম, একটি ছাড়া একশতটি। যে ব্যক্তি এগুলো যথাযথভাবে কাজে লাগাল, সে জান্নাতে প্রবেশ করল।"[23]

আল্লাহর নামসমূহ এ সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রমাণ হলো - আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي»

---

[23] হাদীসটি মুত্তাফাকুন আলাইহি। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৯৮৬।

“আমি আপনার কাছে আপনার সে সব নামের উসিলায় দো‘আ করছি যেসব নাম আপনার রয়েছে, যে নামে আপনি নিজেকে নামকরণ করেছেন অথবা যে নাম আপনি আপনার গ্রন্থে নাযিল করেছেন অথবা আপনার সৃষ্টির কাউকে আপনি শিক্ষা দিয়েছেন কিংবা আপনার কাছে যে গায়েবী ইলম রয়েছে তাতে আপনি যে নাম রেখে দিয়েছেন সেগুলোর উসিলায় আমি প্রার্থনা করছি যে, আপনি মহান আল-কুরআনকে আমার হৃদয়ের প্রিয় বসন্ত করে দিন।”[24]

আল্লাহর নামসমূহের প্রত্যেকটি নামই তাঁর যে কোনো একটি সিফাতকে শামিল করে। অতএব, ‘আল-‘আলীম’ এ নামটি ‘ইলম’ গুণের প্রমাণ বহন করছে। ‘আল-হাকিম’ নামটি হিকমতের প্রমাণ বহন করছে। ‘আস-সামি‘উ’ ও ‘আল-বাছিরু’ এ দু’টো নাম প্রমাণ বহন করছে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির ওপর। **এভাবে প্রত্যেকটি নাম আল্লাহর একেকটি সিফাত বা গুণের প্রমাণ বহন কর**ছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ٢ لَمۡ يَلِدۡ وَلَمۡ يُولَدۡ ٣ وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُۢ ٤﴾ [الاخلاص: ١، ٥]

[24] হাদীসটি মুসনাদ গ্রন্থে (৪৩১৮ নং) ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। ইবন হিব্বান (৯৭২ নং) একে সহীহ হাদীস বলেছেন। এ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নাম নিরানব্বই থেকেও অনেক বেশি। অতএব, পূর্ববর্তী নিরানব্বই নামের হাদীসটি দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ নিরানব্বইটি নাম শিখবে, সেগুলো দ্বারা আল্লাহকে আহবান করবে, আল্লাহর কাছে দো‘আ করবে এবং সেগুলোর উসীলায় আল্লাহর ইবাদাত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এটি এ নিরানব্বইটি নামের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য।

“বল, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোনো সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন। কেউই তাঁর সমকক্ষ নয়।” [সূরা আল-ইখলাস, আয়াত: ১-৪]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসারের এক লোক মসজিদে কুবায় ইমামতি করছিল। যখনি সে কোনো সূরা দিয়ে সালাত শুরু করত তখনি সে ‘কুল-হু আল্লাহু আহাদ’ সূরাটি পাঠ করত। এটি পাঠ শেষ করার পর সে এর সাথে আরেকটি সূরা মিলাত। সে প্রত্যেক রাক‘আতেই এরকম করত। তখন তার সাথীরা এ ব্যাপারে তার সাথে কথা বলল। তারা বলল, তুমি এই সূরা দিয়ে সালাত শুরু করো এরপর অন্য একটি সূরা মিলাও কারণ তোমার কাছে হয়ত এই সূরাটি যথেষ্ট নয়। সুতরাং হয় তুমি এ সূরা দিয়ে পাঠ করবে অথবা এ সূরা ছেড়ে অন্য সূরা পাঠ করবে। তখন সে ব্যক্তি বললেন, ‘আমি সূরা ইখলাস ত্যাগ করতে পারবো না। যদি তোমরা চাও তাহলে আমি তোমাদের এভাবেই ইমামতি করব। আর যদি তোমরা অপছন্দ করো তাহলে আমি তোমাদেরকে ছেড়ে যাবো।’ তাদের অভিমত ছিল সে ব্যক্তি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং তাদের অপছন্দ ছিল যে, তিনি ছাড়া আর কেউ ইমামতি করবেন। যখন তাদের কাছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন তখন তারা তাঁকে সংবাদটি দিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “হে অমুক! তোমাকে তোমার বন্ধুরা যে নির্দেশ প্রদান করছে তা পালন করতে কিসে তোমাকে নিষেধ করছে? আর প্রত্যেক রাক‘আতেই এ সূরা নিয়মিত পাঠে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছে?” তখন তিনি বললেন,

‘আমি এ সূরাটিকে ভালোবাসি।’ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “এ সূরার প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।”[25]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একটি ছোট সৈন্য দলে প্রেরণ করলেন। সে ব্যক্তি তার সাথীদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করত এবং সে ‘কুল-হু আল্লাহ’ দিয়ে সালাত শেষ করত। যখন তারা ফিরে আসল তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, “তাকে জিজ্ঞেস করো কেন সে এ কাজটি করত?” তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, কেননা এ সূরাটি হচ্ছে আল্লাহর গুণ, তাই আমি এ সূরাটি দিয়ে পড়তে ভালোবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাকে এ সংবাদ দাও যে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে ভালোবাসেন।”[26] অর্থাৎ সূরাটি আল্লাহর গুণাবলীকে শামিল করছে।

আল্লাহ তা‘আলা এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল রয়েছে। তিনি বলেন,

﴿وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧﴾ [الرحمن: ٢٧]

[25] হাদীসটি ইমাম বুখারী তার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং ৭৪১।

[26] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৪০।

“আর আপনার রবের চেহারা সত্ত্বাসহ স্থায়ী থাকবেন, যিনি সম্মানিত।” [সূরা আর-রাহমান, আয়াত: ২৭]

এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তাঁর দু’টো হাত রয়েছে। তিনি বলেছেন, ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥] “আমার দু’হাত দিয়ে আমি যা সৃষ্টি করেছি।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৭৫] ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ “বরং তাঁর দুই হস্ত প্রসারিত।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৪]

তিনি এ সংবাদও দিয়েছেন যে, তিনি সন্তুষ্ট হন, তিনি ভালোবাসেন, তিনি ক্রোধান্বিত হন, তিনি রাগান্বিত হন ইত্যাদি আরো অনেক গুণাবলী রয়েছে যেগুলো দিয়ে আল্লাহ নিজেকে বর্ণনা করেছেন অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহর যে সকল নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে শরী‘আতের দলীল রয়েছে সেগুলোর ওপর বিবেকের নিম্নলিখিত দলীলও প্রমাণ বহন করছে:

[১] বিভিন্ন প্রকার, নানা পার্থক্য ও নিজ নিজ কর্তব্য আদায়ে নিজস্ব শৃঙ্খলা নিয়ে এই যে বিশাল সৃষ্টিজগত রয়েছে এবং তাদের জন্য দেওয়া নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা চলছে সেসব কিছুই মহান আল্লাহর মহত্ত্ব, সামর্থ, কুদরত ও তাঁর জ্ঞান-হিকমত-ইচ্ছার ওপর প্রমাণ বহন করছে।

[২] ইহসান এবং দয়া প্রদর্শন, ক্ষতি অপসারণ, বিপদ থেকে উদ্ধার এ সকল কিছুই আল্লাহর রহমত, দয়া, করুণা ও মহত্ত্বের প্রমাণ বহন করছে।

[৩] পাপীদের শাস্তি এবং তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ, তাদের প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও আল্লাহর ঘৃণার প্রমাণ বহন করছে।

[৪] আর অনুগত লোকদের সম্মানিত করা এবং তাদের পুরস্কৃত করা তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার প্রমাণ বহন করছে।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহর নাম ও সিফাতসমূহের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নীতি

পূর্ববর্তী আলিমগণ ও তাদের অনুসারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নীতি হচ্ছে আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী আল-কুরআন ও সুন্নায় যেভাবে এসেছে সেভাবে সাব্যস্ত করা। তাদের নীতি গুলো নিম্ন বর্ণিত নিয়মের উপরে স্থাপিত:

[১] তারা আল-কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী যেভাবে এসেছে সেভাবেই সাব্যসত্ম করে থাকেন এবং এ নাম ও গুণাবলীর শব্দসমূহ যে অর্থ প্রদান করছে তাও তারা সাব্যস্ত করে থাকেন। তারা এ নাম ও গুণাবলীর প্রকাশ্য অর্থ থেকে এগুলোকে পৃথক করেন না। এসব শব্দ ও অর্থকে তার স্থান থেকে পরিবর্তনও করেন না।

[২] তারা এ নাম ও গুণাবলীগুলোর সাথে মাখলুকের গুণাবলীর তুলনীয় হওয়াকে অস্বীকার করেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

“তাঁর মতো কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১১]

[৩] আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ ও গুণাবলী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তারা আল-কুরআন ও সুন্নায় যা এসেছে তা অতিক্রম করে অন্য কোনো বক্তব্য পেশ করেন না। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন তারা তা সাব্যস্ত করেন। আল্লাহ ও তাঁর

রাসূল যা অস্বীকার করেছেন তারা তা অস্বীকার করেন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আল্লাহ সম্পর্কে যে বিষয়ে চুপ ছিলেন তারাও সে বিষয়ে চুপ থেকেছেন।

[৪] তারা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সংক্রান্ত যে বক্তব্য কুরআনে এবং সুন্নায় এসেছে তা *মুহকাম* বা সুদৃঢ় বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, যার অর্থ বোধগম্য এবং যার ব্যাখ্যা প্রদান করা যায় এবং তা অবোধগম্য *মুতাশাবিহ* আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং বোধগম্য নয় এ যুক্তিতে তারা সেসব নাম ও সিফাতের অর্থ আল্লাহর প্রতি অর্পণ করে না; যেমন তাদের প্রতি মিথ্যারোপকারী একদল লোক তাদেরকে অপবাদ দিয়ে থাকে, অথবা তাদের নীতিমালা জানা না থাকার কারণে সমকালীন কতিপয় লেখক বা গ্রন্থকার তাদের প্রতি যে কটাক্ষ করে থাকে।

[৫] তারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর কাইফিয়াত তথা অবয়ব বা ধরণ আল্লাহর কাছেই অর্পণ করে থাকেন এবং এ ব্যাপারে তারা কোনো চিন্তা-গবেষণা করে না।

তৃতীয়ত: যারা আল্লাহর নাম ও সিফাতকে অস্বীকার করে অথবা এর কিয়দংশ অস্বীকার করে তাদের কথার অপনোদন।

এ ধরনের লোক তিন ভাগে বিভক্ত:

[১] জাহমিয়া: তারা হচ্ছে জাহম ইবন সাফওয়ান-এর অনুসারী। এরা আল্লাহর সকল নাম এবং সিফাতকে অস্বীকার করে।

[২] মু'তাযিলা: তারা ওয়াসিল ইবন 'আতা-এর অনুসারী, যিনি হাসান আল-বাসরীর বৈঠক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। এরা আল্লাহর নাম সাব্যস্ত করে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে, এগুলো যাবতীয় অর্থ থেকে মুক্ত শব্দমালা মাত্র। আর তারা আল্লাহর সকল গুণাবলীকে অস্বীকার করে।

[৩] আশা'ইরাহ ও মাতুরিদিয়্যাহ এবং তাদের অনুসারীবৃন্দ: এরা আল্লাহর সকল নাম এবং কিছু সিফাতকে সাব্যস্ত করে আর বাকীগুলোকে অস্বীকার করে। যে সংশয়ের ওপর ভিত্তি করে তারা তাদের মতবাদকে দাঁড় করিয়েছে তা হচ্ছে, তাদের ধারণা অনুযায়ী এ সমস্ত সিফাত সাব্যস্ত করলে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে আল্লাহর নিজেরই তুলনা হয়ে পড়ে। ফলে তা থেকে আমাদের সরে যাওয়া উচিত; কেননা মাখলুকের অনেককেই আল্লাহর সে সমস্ত নাম দ্বারাও নামকরণ করা হয় এবং আল্লাহর সে সমস্ত সিফাত বা গুণাবলী দ্বারাও তাদের গুণ বর্ণনা করা হয়। এর ফলে তাদের ধারণা অনুযায়ী নাম এবং সিফাতের শব্দ ও অর্থের মধ্যে উভয়ের একটি তুলনা ও অংশীদারিত্ব সৃষ্টি হওয়ার কারণে তাদের হাকীকত তথা মূল অর্থের মধ্যে তুলনা ও অংশীদারিত্ব

অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। এতে তাদের দৃষ্টিতে খালেকের সাথে মাখলুকের তুলনাও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ফলে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তারা দু'টোর যে কোনো একটি পথ অবলম্বন করেছে-

এক: তারা এ সকল নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসের যে বক্তব্য রয়েছে, সেগুলোকে তাদের প্রকাশ্য অর্থ থেকে তা'বিল বা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে; যেমন তারা *ওয়াজহ্* বা মুখমণ্ডলকে তা'বিল বা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে আল্লাহর জাত বা সত্ত্বা দ্বারা, *ইয়াদ*কে তা'বিল করে নিয়ামত দ্বারা।

দুই: তারা নাম ও সিফাত সম্পর্কিত কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যগুলোকে আল্লাহর প্রতি সমর্পণ করে এবং বলে যে, এগুলো দ্বারা কি উদ্দেশ্য আল্লাহই ভালো জানেন, আমাদের বোধগম্য নয়। আর এ আকীদা তারা পোষণ করে যে, এ নাম এবং গুণাবলী সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসের বক্তব্যসমূহ দ্বারা প্রকাশ্য অর্থ বুঝানো হয় নি।[27]

আল্লাহর নাম এবং সিফাত যারা প্রথম অস্বীকার করেছে বলে জানা গেছে, তারা হচ্ছে আরবের কতিপয় মুশরিক। আল্লাহ যাদের ব্যাপারে এ বাণী নাযিল করেছিলেন,

---

[27] পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এটি সঠিক পদ্ধতি নয়, এটি ভুল বিশ্বাস। কারণ, আল্লাহ তা'আলার কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত কোনো ধাঁধাঁ গ্রন্থ নয় যে, এখানে এমন কিছু থাকবে যে, তার প্রকাশ্য অর্থ করা যাবে না, আর তার অর্থ বুঝা যাবে না। [সম্পাদক]

﴿كَذَٰلِكَ أَرۡسَلۡنَٰكَ فِيٓ أُمَّةٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهَآ أُمَمٞ لِّتَتۡلُوَاْ عَلَيۡهِمُ ٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ بِٱلرَّحۡمَٰنِۚ﴾ [الرعد: ٣٠]

“অনুরূপভাবে তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির মধ্যে যার পূর্বে আরো বহু জাতি অতিবাহিত হয়ে গেছে, যেন আমি তোমার কাছে যা ওহীরূপে প্রেরণ করেছি তা তুমি তাদের কাছে তিলাওয়াত কর। অথচ তারা রহমানের প্রতি কুফুরী ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।” [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ৩০]

এ আয়াতের শানে নযুল হচ্ছে, কুরাইশরা যখন শুনতে পেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আর-রাহমান’ নামটি উল্লেখ করছেন তখন তারা তা অস্বীকার করল। আল্লাহ তখন তাদের ব্যাপারে নাযিল করলেন ﴿وَهُمۡ يَكۡفُرُونَ بِٱلرَّحۡمَٰنِۚ﴾ “তারা রাহমানের প্রতি কুফুরী ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছে”। ইবন জারির বলেন যে, এটি ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাদের মধ্যকার সন্ধির বিষয়ে লেখক লিখছিল, “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম”। **তখন কুরাইশরা বলেছিল**, ‘রাহমান’ নামটি তো আমাদের জানা নেই।

ইবন জারির ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে আরো বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদারত অবস্থায় দো‘আ করার সময় বলছিলেন, ইয়া রাহমান! ইয়া রাহীম! তখন মুশরিকরা বলল, এ ব্যক্তি ধারণা করে যে, সে এক সত্ত্বাকে আহ্বান করে অথচ সে তো দু’জনকে আহ্বান করছে। তখন নাযিল হলো,

﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ﴾ [الاسراء: ١١٠]

“আপনি বলুন যে, তোমরা আল্লাহকে আহ্বান করো বা রাহমানকে আহ্বান করো, যাকেই তোমরা আহ্বান করো না কেন তার তো রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ১১০]

আল্লাহ তা‘আলা সূরা ফুরকানের মধ্যে বলেছেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواْۤ لِلرَّحۡمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحۡمَٰنُ﴾ [الفرقان: ٦٠]

“যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা রাহমানের উদ্দেশ্যে সাজদাহবনত হও তখন তারা বলে রাহমান কে?” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬০]

এ মুশরিক ব্যক্তিরাই হচ্ছে জাহমিয়া, মু‘তাযিলা, আশা‘ইরা এমন প্রত্যেক অস্বীকারকারীর পূর্বসুরী, যারা আল্লাহর সে সব নাম ও গুণাবলীকে অস্বীকার করে যে সব নাম তিনি নিজেই সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

আর তারা (মুশরিকরা) খারাপ উত্তরসুরীর জন্য কতই না খারাপ পূর্বসুরী।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে এ ভ্রান্ত দলগুলোর বিরুদ্ধে কয়েকভাবে জওয়াব দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম জওয়াব: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর নিজের জন্য অনেকগুলো নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর জন্য তাঁর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেসব নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং সেগুলো বা তার কিয়দংশকে অস্বীকার করা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা সাব্যস্ত করেছেন তা অস্বীকার করারই শামিল। আর এ কাজটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করারই নামান্তর।

দ্বিতীয় জবাব: মাখলুকের মধ্যে এ গুণাবলীর অস্তিত্ব থাকার কারণে কিংবা মাখলুকের কেউ কেউ এসব নামের কোনো কোনোটি দ্বারা নাম রাখার কারণে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সাদৃশ্য হওয়া মোটেই অপরিহার্য হয় না। কেননা আল্লাহর রয়েছে এমন সব নাম ও গুণাবলী যা তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট। আর মাখলুকেরও রয়েছে এমন নাম ও গুণাবলী যা তাদের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন আল্লাহর এমন এক সত্ত্বা রয়েছে যা মাখলুকের সত্ত্বার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। সুতরাং তাঁর যেসব নাম ও গুণাবলী রয়েছে তাও মাখলুকের নাম ও গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। নাম এবং সাধারণ অর্থের মধ্যে মিলিত হওয়ার দ্বারা এগুলোর মূল প্রকৃতিতে মিলিত হওয়াকে অপরিহার্য করে না। আল্লাহ নিজেই নিজের নাম দিয়েছেন ‘আল-‘আলীম’ ও ‘আল-হালীম’। অথচ তিনি তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে ‘আলীম’ নামে অভিহিত করেছেন যেমন তিনি বলেছেন,

﴿وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ ۝٢٨﴾ “আর তারা তাঁকে জ্ঞানী একটি সন্তানের সুসংবাদ দিল।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ২৮]

এখানে জ্ঞানী সন্তান বলতে ইসহাক আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। অন্য আরেক বান্দাকে তিনি নাম দিয়েছেন ‘হালীম’। যেমন, তিনি বলেছেন, ﴿فَبَشَّرۡنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٖ ١٠١﴾ “আর আমরা তাঁকে সুসংবাদ দিলাম একজন সহনশীল সন্তানের।” [সূরা আস-সাফফাত, আয়াত: ১০১] এখানে সহনশীল সন্তান বলতে ঈসমাইল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। এখানে ‘আল-‘আলীম’ ও আলীম এক নয় যেমনিভাবে ‘আল-হালীম’ ও হালীম এক নয়।

আল্লাহ নিজেকে নাম দিয়েছেন ‘আস-সামি‘ই’ এবং ‘আল-বাছীর’ বলে। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨﴾ “নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৮]

তিনি তাঁর কিছু কিছু বান্দাকে সামি‘ই এবং বাছীর নামে অভিহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

﴿إِنَّا خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن نُّطۡفَةٍ أَمۡشَاجٖ نَّبۡتَلِيهِ فَجَعَلۡنَٰهُ سَمِيعَۢا بَصِيرًا ٢﴾ [الانسان: ٢]

“অমরা তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এ জন্য আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টিবান।” [সূরা আল-ইনসান, আয়াত: ২] এখানে উল্লিখিত সামীয়‘ বা ‘শ্রবণশক্তি সম্পন্ন’ আর ‘আস-সামিয়’ একরকম নয়। আবার ‘বাছীর’ বা দৃষ্টিবান ও ‘আল-বাছীর’ অনুরূপ নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে।

আল্লাহ তা'আলা নিজেকে নাম দিয়েছেন 'আর-রাউফ' এবং 'আর-রাহীম' বলে। তিনি বলেছেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٦٥﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ালু ও করুণাময়।" [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৬৫] অপরদিকে তিনি তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে 'রাউফ' এবং 'রাহীম' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন,

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨﴾ [التوبة: ١٢٨]

"নিশ্চয় তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর কাছে কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১২৮]

এখানেও এ 'রাউফ' সে আর-রাউফের মত নয় যা আল্লাহর নাম এবং এ 'রাহীম' সে আর-রাহীমের মতোও নয় যা আল্লাহর নাম।

অনুরূপভাবে আল্লাহ নিজের অনেক গুণ বর্ণনা করেছেন এবং একইরূপ গুণের বর্ণনা তিনি তাঁর কোনো কোনো বান্দার ক্ষেত্রেও করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ﴾ "তারা তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই পরিবেষ্টন করতে পারে না।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫]

তিনি তাঁর নিজেকে জ্ঞানের গুণে গুণান্বিত করেছেন। আবার তিনি তাঁর বান্দাদেরও জ্ঞান আছে বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ﴿وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلٗا ٨٥﴾ "তোমাদেরকে খুব কম জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে।" [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৫] তিনি আরো বলেন, ﴿وَفَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ ٧٦﴾ "প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর রয়েছে এক মহা জ্ঞানী।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৭৬] তিনি আরো বলেন, ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ﴾ "যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল।" [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮০] তিনি নিজের শক্তির গুণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٤٠﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী ও পরাক্রমশালী।" [সূরা আল-হাজ, আয়াত: ৪০] তিনি আরো বলেন, ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ ٥٨﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ রিজিকদাতা, শক্তিমান পরাক্রমশালী।" [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৮] আবার তিনি তাঁর বান্দাদের ক্ষেত্রেও শক্তির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

﴿۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعۡفٖ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ ضَعۡفٖ قُوَّةٗ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٖ ضَعۡفٗا وَشَيۡبَةٗۚ﴾ [الروم: ٥٤]

"আল্লাহই তোমাদেরকে দূর্বল থেকে সৃষ্টি করেছেন তারপর দূর্বলতার পরেই শক্তি দিয়েছেন। তারপর শক্তি দেওয়ার পর আবারও দূর্বলতা ও বার্ধক্য দিয়েছেন।" [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৫৪] এ রকম আরো অনেকগুলো আয়াত রয়েছে।

এ কথা সবার জানা যে, আল্লাহর নামসমূহ ও তাঁর গুণাবলী তাঁর সাথে নির্দিষ্ট এবং তাঁরই উপযোগী। আর সৃষ্টিজগতের নাম ও গুণাবলী তাদের সাথেই নির্দিষ্ট ও তাদের উপযোগী। অতএব, নাম এবং অর্থের মধ্যে একরকম হওয়ার দ্বারা তার হাক্বীকত ও মূলের মধ্যে একরকম হওয়া অপরিহার্য হয় না। কেননা দু'টো একই নাম বিশিষ্ট দুই ব্যক্তি এবং একই গুণ বিশিষ্ট দুই ব্যক্তি একরকম হওয়াটা অপরিহার্য নয় এটা স্পষ্ট।

তৃতীয় জবাব: যার কোনো পরিপূর্ণ গুণাবলী নেই সে ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এজন্যই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর বাবাকে বলেছিলেন, ﴿لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ﴾ "আপনি কেন এমন বস্তুর ইবাদাত করছেন যা শুনেও না দেখেও না?" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪২] যারা গো-বাছুরের ইবাদাত করেছিল তাদের জবাব দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, ﴿أَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمۡ وَلَا يَهۡدِيهِمۡ سَبِيلًاۘ﴾ "তারা কি দেখে নি যে, এ গো-বাছুরটি তাদের সাথে কথা বলতে পারে না এবং তাদেরকে কোনো পথও দেখাতে পারে না?" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৪৮]

চতুর্থ জবাব: আল্লাহর জন্য গুণাবলী সাব্যস্ত করা তাঁর পরিপূর্ণতার পরিচায়ক। আর এ গুণাবলী তাঁর থেকে অস্বীকার করা তাঁর ক্ষেত্রে ত্রুটি সৃষ্টিকারী। কেননা যার কোনো গুণ নেই সে হয়ত অস্তিত্বহীন অথবা ত্রুটিপূর্ণ। আল্লাহ এসব কিছু থেকেই পবিত্র।

পঞ্চম জবাব: আল্লাহর গুণাবলীসমূহকে তার প্রকাশ্য ও স্পষ্ট অর্থ থেকে তাবিল করার কোনো দলীল নেই। তাই তাবিল করাটা বাতিল বলে গণ্য। আর বোধগম্য নয় এ যুক্তিতে এ গুণাবলীগুলোর অর্থ আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা অর্থাৎ 'আল্লাহই ভালো জানেন' এ কথা বলার দ্বারা এটা অপরিহার্য হয় যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আমাদেরকে এমন বক্তব্য দ্বারা সম্বোধন করেছেন যার অর্থ আমরা বুঝি না। অথচ তিনি আমাদেরকে তাঁর নাম ধরে ডাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। সুতরাং আমরা কিভাবে তাঁকে এমন কিছু দ্বারা ডাকবো যার অর্থ আমরা জানি না? আমাদেরকে পুরো কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার নির্দেশ দান করা হয়েছে। তিনি কিভাবে আমাদেরকে এমন কিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনার নির্দেশ প্রদান করেন যার অর্থ আমরা বুঝি না?

এসব কিছু থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আল্লাহর নামসমূহ এবং তাঁর গুণাবলী অবশ্যই যেভাবে তাঁর জন্য উপযোগী হয় সেভাবে তাঁর জন্য সাব্যস্ত করাটা অত্যন্ত জরুরী। তবে পাশাপাশি মাখলুকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করতে হবে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [الشورى: ١١]

"কোন কিছুই তাঁর মতো নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শুরা, আয়াত: ১১]

অতএব, তিনি কোনো কিছু তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়াকে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর নিজের জন্য শ্রুতিশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে সাব্যস্ত

করেছেন। এ দ্বারা বুঝা গেল যে, সিফাত সাব্যস্ত করার দ্বারা সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য হয় না এবং এটাও বুঝা গেল যে, সাদৃশ্য অস্বীকার করেই সিফাতকে সাব্যস্ত করতে হবে। এটাই হচ্ছে আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে অস্বীকার ও সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের নীতিকথার অর্থ অর্থাৎ কোনো সাদৃশ্য স্থাপন ছাড়াই তাঁর গুণাবলী সাব্যস্ত করতে হবে এবং বাতিল করা ছাড়াই তাঁর গুণাবলিকে পবিত্র রাখতে হবে।

এ বইটিতে ইসলামী আকীদার পরিচিতি, আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী আকীদার গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাওহীদ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে।